বিজ্ঞান পত্রিকা

দশম সংখ্যা | জানুয়ারী ২০১৮

‘বিজ্ঞান’ (www.bigyan.org.in) – এর কিছু বাছাই লেখার সংকলন

দশম সংখ্যা | জানুয়ারী ২০১৮

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

জ্যামিতির গোড়ার কথা : ইউক্লিড থেকে রীমান ০৬
স্বর্ণেন্দু শীল

জ্যামিতির নাম শুনলেই চোখের সামনে সম্পাদ্য, উপপাদ্য এইসব ভেসে ওঠে। জ্যামিতির ছবি এঁকে আমরা অনেকে মজা পেয়েছি, আবার উপপাদ্য পড়তে গিয়ে অনেক জায়গায় হোঁচটও খেয়েছি। এই পর্ব থেকে স্বর্ণেন্দু শীল আলোচনা করবেন সেই "জ্যামিতির গোড়ার কথা"।

দূষিত বায়ু দূত হয়ে যায় দূরের দূর্বা ঘাসে ১২
পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

কিছু দিন আগেই দিল্লিতে গাড়ির 'অড-ইভেন' নিয়ম নিয়ে প্রচুর হৈ-চৈ হলো। পরিবেশ দূষণ এখন ভারতের অনেক শহরে ভীতিকর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে - কিন্তু সেই নিয়ে ভারতে কতটা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে? পড়ুন পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবীর কলমে।

অকাজের বিজ্ঞান, কাজের আবিষ্কার ১৭
সুপ্রতীক পাল

মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে হামেশাই কথা ওঠে: যেসব প্রশ্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না, তার পিছনে ধাওয়া করে হবেটা কি? কিন্তু সত্যিই কি মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না? যেসব প্রযুক্তি আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে - যেমন ইন্টারনেট, জি.পি.এস., এম.আর.আই আর রেডিয়েশন থেরাপি - এরা যে অন্য কথা বলে। সকলেই যে মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে জন্ম নিয়েছিল! সেই ইতিহাস-ই শুনুন ব্যাকরণ সিং-এর মুখ থেকে। মৌলিক গবেষণাকে নিজের মতো চলতে দিলে কি কি চমৎকার হতে পারে, তার কিছু নমুনা তুলে ধরেছেন সুপ্রতীক পাল।

সৌরশক্তিকে বাষ্পবন্দী করার নতুন ফন্দি ২৬
অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায় ও অনির্বান ঘোষ

সৌরশক্তির সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করে সেই শক্তিকে কাজে লাগানো সহজ কাজ নয়। সূর্য থেকে আসা শক্তির একটা বড়সড় অংশ তাপের কুপরিবাহী জলকে গরম করতে গিয়ে, যাকে বলে, জলাঞ্জলি যায়। এই সমস্যার একটা সমাধান বার করেছেন ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি তারা একটা নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন যাতে জলের পরিবহনক্ষমতার উপর আর ভরসা করার দরকার পড়ে না। সেই পদ্ধতির কেরামতি নিয়ে লিখছেন অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায় ও অনির্বান ঘোষ।

পাঠকের দরবার – মহাকর্ষ সূত্রে বিন্দু ভর ৩০
সুমন্ত্র সরকার

পাঠকের দরবার' বিভাগের এই পর্বে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানের পোস্ট-ডকটরাল গবেষক ডঃ সুমন্ত্র সরকার উত্তর দিচ্ছেন আবু নঈম শিকদারের করা প্রশ্নের। মূল প্রশ্নটি হল- "মহাকর্ষ সূত্রে বিন্দু ভরের ধারণা কেন ব্যবহার করা হয়?"

সম্পাদকীয়

নয় নয় করে আটকে না থেকে 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র দশম সংখ্যা প্রকাশিত হল। আমাদের 'বিজ্ঞান' ওয়েবসাইটে পূর্বে প্রকাশিত কিছু বাছাই করা লেখাকে এক জায়গায় গুছিয়ে পরিবেশন করা এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। পত্রিকার এই সংখ্যায় 'বিজ্ঞান'-এর কর্মকাণ্ডে জড়িত স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা এবং আরো বিজ্ঞানরসিক স্বেচ্ছাসেবীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখেই কিছু কথা বলছি।

'বিজ্ঞান'-এর পরিবারের ব্যাপ্তি আজ বিশ্বজুড়ে। পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা পাঠক, গবেষক, লেখক, শিল্পী, প্রযুক্তিবিদ এবং প্রচারক সবাই একজোট হয়ে সব সময় চেষ্টা চালিয়ে চলেছি কি ভাবে বিজ্ঞানের মজাকে আরো বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, আমাদের একান্ত আপন মাতৃভাষা বাংলায়। আমাদের উদ্দেশ্য যেমন, "প্রচার ও প্রসার", ঠিক তেমনই প্রকাশিত লেখার বিজ্ঞান ভিত্তিক উচ্চমান বজায় রাখা আমাদের মূল নীতি। 'বিজ্ঞান' তার উদ্দেশ্যে যতটুকু এগোতে পেরেছে তার মূল কারণ হল স্বেচ্ছাসেবীদের নিরলস পরিশ্রম। আবার, অনেক বিজ্ঞানপ্রেমী 'বিজ্ঞান' পরিচালনার দলে সরাসরি যুক্ত না থেকেও নানা কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন ওয়েবসাইটের জন্মের শুরু থেকে। তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক ভাবে চিরকৃতজ্ঞ।

'বিজ্ঞান'-এর পথ চলা শুরু হয়েছিল প্রায় চার বছর আগে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ২৮-শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ থেকে। শুরু হয়েছিল মাত্র চারজনকে সঙ্গে করে আর পুঁজি ছিল মাত্র গুটি কয়েক লেখা, তাও বেশির ভাগ লেখা ছিল উদ্যোক্তাদের নিজেদের। আমাদের সৌভাগ্য কিছুদিনের মধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বেশ কিছু বিজ্ঞানের অধ্যাপক, গবেষক, স্কুল শিক্ষক, বিজ্ঞানের বার্তাবাহক, চিকিৎসক, এমনকি কিছু চিত্র ও অঙ্কনশিল্পীও। যার ফলে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। গবেষণাজগতে ব্যবহৃত peer-review পদ্ধতিতে প্রকাশিত লেখার বৈজ্ঞানিক গুণমান নজর এড়ায়নি অনেকের। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যুক্ত হয়েছেন অনেক গবেষক এবং বিজ্ঞান রসিক। পরিশ্রম করে চলেছেন বিজ্ঞানের মানোন্নয়নে।

'সবে মিলে করি কাজ' করতে গিয়ে জন্ম নিতে শুরু করে অনেক পরিকল্পনার। যেমন, 'পুরাতনী' বিভাগ শুরু হল বাংলাভাষার সেরা কিছু জনপ্রিয় বইয়ের ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলার লক্ষ্যে। প্রথম কাজ হল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলার কীট-পতঙ্গ' বইটির ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরী। কিন্তু এত বড় একটি বই বাংলায় টাইপ করা তো অনেক সময় সাপেক্ষ! উপায় একটাই, প্রচুর স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়া। ফেসবুকে পরিকল্পনার কথা জানাতেই মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কুড়ি জন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিজ্ঞানপ্রেমী। 'বিজ্ঞান'-এর নানা বিভাগ - 'পাঠকের দরবার', 'বিজ্ঞান পত্রিকা' ইত্যাদি শুরু হয়েছে ঠিক একই ভাবে - কিছু স্বেচ্ছাসেবীর উৎসাহে ও দায়িত্বে।

আজ, জন্মের চার বছর পরে, 'বিজ্ঞান' বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানপ্রেমীর একত্রিত হওয়ার এক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। আমাদের জ্ঞানমতে এমন মঞ্চ বাংলায় আগে তৈরি হয়নি। এই মঞ্চের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক নতুন পরিকল্পনা নিতে পারব বলে আমাদের আশা। এখনই আমাদের হাতে রয়েছে বেশ কিছু পরিকল্পনা, যেমন অডিও বুক, ইংরাজী অ্যানিমেশন ভিডিওর বাংলা সাবটাইটেল, ইংরাজী কিছু আর্টিকলের বঙ্গানুবাদ, আরও অনেক পুরাতন বইয়ের ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরী করা, গ্রাফিক আর্টস এবং সর্বজনীন প্রচার। বর্তমান কার্যকলাপ বজায় রেখে নতুন পরিকল্পনার উপর কাজ করতে লাগবে অনেক উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক। 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র দশম সংখ্যার সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাঠকদের আমাদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য।

‘বিজ্ঞান’ একটি অলাভজনক সংস্থা এবং উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক। আমাদের সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য সীমিত। তাই সেই সীমিত সাধ্যকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে দরকার আপনাদের। আসুন না সেই স্বপ্নের ‘বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজ’ গড়ে তুলতে এবং বাস্তবের রূপ দিতে আমরা সবাই একজোট হই।

এবার আসুন ‘বিজ্ঞান পত্রিকার’ দশম সংখ্যার লেখাগুলি ভাগ করে নিই আপনাদের সাথে। ফিরে যাই জ্যামিতির গোড়ার দিনগুলোতে এবং ইউক্লিড-এর হাত ধরে একটা একটা স্বতঃসিদ্ধ জুড়ে তৈরী করি আমাদের পরিচিত জ্যামিতিকে। কিংবা করেই ফেলি সেই প্রশ্নটা যেটা হয়তো মাথায় উঁকি মারছে: মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা করে কি হবে মশাই? কোন কাজে আসে এই গবেষণা? ওদিকে ভারতের কিছু শহরে যে আজ নিঃশ্বাস নেওয়া দুষ্কর হয়ে গেছে, সেই সত্যিটার সাথেও মুখোমুখি হওয়া যাক। কিংবা আশার পথ খোঁজা যাক কয়লার পরিবর্তে সৌরশক্তির উপর আরো নির্ভরশীল হয়ে। আর যদি এই ভারী বিষয়গুলো থেকে একটু ব্রেক-এর দরকার হয়, স্কুলের বিজ্ঞান-এর একটা ধাঁধা নিয়ে একটু ভাবা যাক: টেবিল-চেয়ার-পৃথিবী এরা এতটা জায়গা জুড়ে আছে, অথচ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে এদের বিন্দু হিসেবে ধরলেই চলে, এটা কি করে হচ্ছে?

তাহলে ওই কথাই রইলো। চুটিয়ে পড়ুন এবং বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রী, পাড়ার সাইন্স ক্লাবের সদস্যদের পড়ান। এবং সেই সাথে যদি আমাদের সাথে মাঠে নামতে চান বিজ্ঞানকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে-, তাহলে আমরা খুবই খুশী হবো। যোগাযোগের জন্য আমাদের ই-মেইল অ্যাডরেস: bigyan.org.in@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী, ‘বিজ্ঞান’
জানুয়ারী ২০১৮

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম কম্প্যুটিং, ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, সিনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শ্রীনন্দা ঘোষ (NGO পদক্ষেপ ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ড্রেসডেন, জার্মানী)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সূর্যকান্ত শাসমল (ক্যাপজেমিনাই, কলকাতা)
- নীলাব্জ চ্যাটার্জী (ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, নরওয়ে)
- দীপ্যমান প্রামাণিক (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (রাদারফোর্ড আপেলটন ল্যাবরেটরি, ইউনাইটেড কিংডম)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- সুদীপ্ত ব্যানার্জী (NGO পদক্ষেপ ও এমপ্লয়ী বেনিফিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শিলাদিত্য দেওয়াসি (NGO পদক্ষেপ ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)
- অমিয় মাজি (পারডিউ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, জুনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- কৌশিক দাস, অধ্যাপক, মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টার্ণ শোর (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)

এবং সহযোগিতা করছেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অনেক বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী।

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র সম্পাদনা – শ্রীনন্দা, সূর্যকান্ত, নীলাব্জ, কুণাল, অনির্বাণ, ও রাজীবুল।

‘বিজ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র লোগোর মূল ভাবনা – নীলাঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ইপাব পত্রিকা : নীলাব্জ, কুণাল

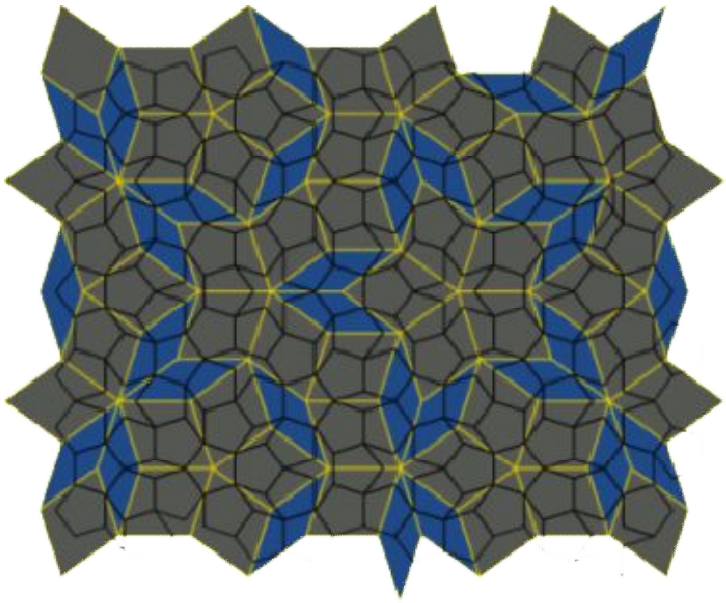

জ্যামিতির গোড়ার কথা : ইউক্লিড থেকে রীমান

স্বর্ণেন্দু শীল

|| ১ম পর্ব ||

জ্যামিতি আমরা সকলেই কমবেশি পড়েছি, মজাও পেয়েছি... কিন্তু এই প্রশ্নটা কি আমরা কখনো ভেবেছি: এই যে জ্যামিতিতে এত উপপাদ্য-সম্পাদ্য, এগুলোর জন্যে আমাদের ঠিক কোন জিনিসগুলো লাগে? মানে ঠিক কতটুকু কেউ আমাদের দিয়ে দিলেই জ্যামিতির বাকিটা আমরা নিজেরাই ভেবে ভেবে বের করে ফেলতাম। অনেক সময় লাগত হয়ত...কিন্তু পারতাম।

আমি জানি অনেকের কাছেই এই প্রশ্নটাই অদ্ভুত লাগবে, কারণ জ্যামিতি তো সবটাই ভেবে ভেবেই বের করা। এতে আবার দেওয়া কি আছে, কিই বা দেওয়া থাকবে বা থাকতে পারে? আজকে আমরা এই প্রশ্নগুলো নিয়েই মাথা ঘামাব –

- জ্যামিতিতে সত্যিই কিছু দেওয়া আছে কিনা?
- আদৌ কিছু দেওয়া থাকার প্রয়োজন আছে কিনা?
- যদি থাকে তবে কি দেওয়া আছে, কি দেওয়া থাকতে হয়?
- সবচেয়ে কম কতটুকু দেওয়া থাকলেই আমরা জ্যামিতি বলতে যা বুঝি সেই সবটা করতে পারি ?

এই প্রশ্নগুলোকেই আমরা জ্যামিতির গোড়ার কথা বলব। গোড়া অর্থে এখানে ভিত, শুরু নয়। কারণ এই প্রশ্নগুলোর কথা ভেবে কেউ জ্যামিতি শিখতে শুরু করে না, করলে সেভাবে শেখাটা বেশ শক্তই হত। যাই হোক, প্রশ্ন যখন তুলেই ফেলা হয়েছে

তখন ভাবনাচিন্তা শুরু করা যাক। নিশ্চয়ই এর মধ্যেই আমাদের অনেকের মনে পড়েছে ইউক্লিডের স্বতস্বিদ্ধগুলোর কথা [১]। স্বতস্বিদ্ধগুলো যখন ধরে নিয়েই জ্যামিতি শুরু করতে হত, তখন সেগুলো দেওয়া থাকা জিনিসই, given, a priori।

আলোচনা গড়াবার আগে চট করে একবার দেখে নিই এই স্বতস্বিদ্ধগুলো কি:

[১] যেকোনো দুটি বিন্দু দেওয়া থাকলে ওই দুটি বিন্দু দিয়ে যায় এরকম সরলরেখা আঁকা যায়।

[২] যেকোনো সরলরেখাংশকে ক্রমাগত বর্দ্ধিত করে একটি সরলরেখা পাওয়া যায়।

[৩] একটি বিন্দু ও একটি দূরত্ব দেওয়া থাকলে ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে ওই দূরত্বের সমান ব্যাসার্ধের বৃত্ত আঁকা যায়।

[৪] সমস্ত সমকোণ পরস্পরের সমান।

[৫] একটি সরলরেখা অন্য দুটি সরলরেখাকে ছেদ করলে যদি কোন একটি দিকে অন্তর্বর্তী কোণদ্বয়ের যোগফল ১৮০ ডিগ্রীর কম হয়, তবে সরলরেখাদুটিকে অনির্দিষ্টভাবে বর্দ্ধিত করলে সেই দিকে মিলিত হবে।

পাঁচ নম্বরটা খানিক খটমট। সেটায় আমরা পরে ফিরে আসব, কিন্তু প্রথম চারটেয় দেওয়া থাকার কি আছে? এইটাই মনে হচ্ছে না? অনেক কিছুর মতই এতেও ইউক্লিডের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বুঝেছিলেন বা আন্দাজ করেছিলেন যে এভাবে আলাদা করে এগুলো লেখার সুফল থাকলেও থাকতে পারে।

আচ্ছা দু'নম্বরটাকে নিয়েই ভাবা যাক। আমরা যদি একটা কাগজের উপর জ্যামিতি কষতে বসি তাহলেই তো দ্বিতীয়টা সত্যি নয়। সরলরেখা অসীম, অথচ কাগজটা একসময় শেষ হয়ে যাবে। আবার ধরুন কাগজে দুটো বিন্দু এঁকে বিন্দু দুটোর মাঝখান দিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললাম। এক নম্বরটাও আংশিকভাবে সত্যি নয় আর সরলরেখার জায়গায় সরলরেখাংশ চাইলেও নয়।

আরও একটা উদাহরণ দিই। একটা বৃত্ত আঁকুন, বৃত্তের ওপরে একটা বিন্দু নিন। এবার ওই বিন্দু থেকে ব্যাস টানলে সেটা উল্টোদিকে বৃত্তের যেখানে ছেদ করবে সেই বিন্দুটা আর আগের বিন্দুটাকে একটা সরলরেখাংশ দিয়ে যোগ করার চেষ্টা করুন। বৃত্তটা কম্পাস দিয়ে এঁকে থাকলে পারবেন না করতে, কারণ কম্পাস বসানোর জন্য বৃত্তের কেন্দ্রটা গেছে ফুটো হয়ে। তাহলে বলতেই হবে যে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধে কিছু একটা দেওয়া আছেই, একদম ফালতু নয় ওগুলো। কিন্তু ঠিক কি দেওয়া আছে?

আগের উদাহরণগুলো থেকে এর উত্তর দেওয়া যায়। এক নম্বরটা আসলে বলছে যার ওপরে আমরা জ্যামিতি কষব সেই জিনিসটা অসীম। দু' নম্বরটা বলছে তাতে ছেঁড়া-ফাটা নেই, ফুটো-টুটোও নেই। অনেকক্ষণ 'সেই জিনিসটা' বলে চালাচ্ছি, এইবার সেই জিনিসটার একটা নাম দেব আমরা। এই জিনিসটাকে, যার ওপর জ্যামিতি করব আমরা, তাকে বলে ইউক্লিডীয় স্থান, যার ইংরাজি নাম ইউক্লিডিয়ান স্পেস।

স্থানের মাত্রার উপর অবশ্য নিয়ম-কানুন বিশেষ নেই। যেকোনো মাত্রা, মানে যেকোনো প্রাকৃতিক সংখ্যাই হতে পারে। দ্বিমাত্রিক ইউক্লিডীয় স্থান

আমাদের ওই কাগজটার মতই। শুধু সবদিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত আর ফুটো-ছেঁড়া, এমনকি কোথাও কোঁচকানো বা ভাঁজ থাকাও চলবে না। ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় স্থান আমাদের চারপাশের ফাঁকা জায়গার মতনই। শুধু এও সবদিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত আর ফুটো-ছেঁড়া, এমনকি কোথাও কোঁচকানো বা ভাঁজ থাকা চলবে না। এখানে একটা বিশাল গোলমাল হবে, কারণ ত্রিমাত্রিক স্থানে ফুটো-ছেঁড়াটা বুঝতে পারলেও কোঁচকানো বা ভাঁজ থাকাটা কল্পনা করা বেশ শক্ত আমাদের পক্ষে। কারণ আমরা নিজেরাও ত্রিমাত্রিক জীব। কিন্তু জ্যামিতির মত এত মজার একটা জিনিসের জন্যে সেই কষ্ট আমরা করলামই নাহয়।

তিন নম্বর স্বতঃসিদ্ধ বলছে – একটি বিন্দু ও একটি দূরত্ব দেওয়া থাকলে ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে ওই দূরত্বের সমান ব্যাসার্ধের বৃত্ত আঁকা যায়। এখানে যা বলা হল সেটা বুঝতে এমনিতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই এখানে যে আদৌ কিছু একটা 'দেওয়া হল', সেটা খেয়াল করা একটু মুশকিল। এখানে আসলে যেটা দেওয়া হল সেটা হল একটা স্কেল বা রুলার! মানে দূরত্ব মাপার একটা কিছু।

চার নম্বর স্বতঃসিদ্ধ ভয়ানক গোলমেলে। এটা বলছে – সমস্ত সমকোণ পরস্পরের সমান। কিন্তু এর মানে কি? গোলমেলে ব্যাপারটায় যাচ্ছি, তবে তার আগে আরেকটা জিনিস খেয়াল করব। তিন নম্বর স্বতঃসিদ্ধ যেমন দূরত্ব মাপার একটা কিছু দেয়, এখানে কোণ মাপার কিছু একটা লাগবে আমাদের। কিন্তু তাও বাকিটা পরিষ্কার নয়। সেটা পরিষ্কার করতে আমরা প্রথমে সমকোণের সংজ্ঞা খুঁজব। সেটা হলো এইরকম:

'দুইটি সরলরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ এক সমকোণ।'

এইবার বোধহয় ব্যাপারটা খানিক পরিষ্কার হল, তাই না? মানে চার নম্বর আসলে বলছে – যেকোনো দুইটি সরলরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করলে তাদের উৎপন্ন কোণ সমান।

এখানে মনে হতে পারে যে আমরা একটা শব্দের বদলে আর একটা শব্দ বসালাম। আগে বলছি সব সমকোণ সমান। এখন বলছি লম্বভাবে ছেদ করলে তাদের উৎপন্ন কোণ সমান। লম্বভাবে ছেদ করা কথাটার মানে কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে: দুটি সরলরেখা যখন পরস্পরকে ছেদ করে ও তাদের উৎপন্ন কোণের মান এক সমকোণ হয়, তখন ওই দুই সরলরেখাকে পরস্পরের উপর লম্ব (বা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করেছে) বলা হয়। তবে এই উত্তর দিলে আমাদের যুক্তিটা শুধুই গোল গোল ঘুরতে থাকবে। 'লম্বভাবে ছেদ করা' ব্যাপারটাকে অন্যভাবে বলতে হবে।

এই ফাঁকে সংজ্ঞা নিয়েও খানিক আলোচনা করা যাক। এতক্ষণ অবধি কোন সংজ্ঞা না বলেই আমরা কাজ চালাচ্ছিলাম। তার কারণ হলো – ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এ সংজ্ঞা আছে প্রথমেই, কিন্তু সারা বইতে কোথাও সেই সংজ্ঞাগুলোর কথা আর কখনো সেভাবে আসেনি [২]। তাছাড়া বেশিরভাগ সংজ্ঞাই খুব গোলমেলে। যেভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেইভাবেই বাকি বইতে সবসময় ব্যবহার হয়েছে তাও নয়।

আর একটা ব্যাপার হল, সংজ্ঞারা কিন্তু ঠিক জ্যামিতিতে দেওয়া থাকা জিনিসগুলোর মধ্যে নয়। ভালো সংজ্ঞা তৈরী করতে হলে, কোন জিনিসগুলো

আগে সংজ্ঞায়িত করব, আর কোনগুলোর জন্য আগে সংজ্ঞায়িত জিনিসগুলোর সাহায্য নেব, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত খুবই জরুরী। কাজের অনেক সুবিধে হয় তাতে, বুঝতেও। অবশ্য জ্যামিতির অনেক জিনিসেরই নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না। যেমন বিন্দু। বিন্দুর এমন কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবই না যেটা থেকে বিন্দু কি, এইটা সহজে বোঝা যাবে। অথচ বিন্দু কি সে তো আমরা জানি একরকম। এই একরকম জানি অথচ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, এমন জিনিসগুলোকে অঙ্কে বলা হয় primitives বা primitive notions। আমরা বলব অসংজ্ঞায়িত প্রাথমিক ধারণা [৩]।

মোদ্দা কথাটা হল, সংজ্ঞাই হোক কি অসংজ্ঞায়িত প্রাথমিক ধারণাই হোক, এগুলো জ্যামিতিতে দেওয়া থাকা জিনিস নয়। এগুলো আমরা বেছে নিতে পারি। হিলবার্ট ১৮৯৯ সালে জ্যামিতিকে অন্যভাবে সাজিয়েছিলেন [৪]। এই প্রসঙ্গে হিলবার্টের মন্তব্য – "আমরা বিন্দু, সরলরেখার জায়গায় চেয়ার, টেবিল, বীয়ারের মগ এইসব দিয়েও জ্যামিতি শুরু করতে পারতাম।" এর অর্থ হলো: কি দিয়ে শুরু করব তা সুবিধার জন্যে খুব জরুরী জিনিস, কিন্তু নীতিগতভাবে জরুরী নয়।

কিন্তু, স্বতঃসিদ্ধগুলো একদমই দেওয়া থাকা জিনিস। সেগুলো আলাদা হলে যে জ্যামিতি আমরা পাব তা বেশ আলাদা হবে, ভীষণভাবেই আলাদা [৫]।

যাই হোক, এক, দুই, তিন আর চার নম্বর স্বতঃসিদ্ধ কি বলছে আমরা দেখলাম। এও দেখলাম সংজ্ঞা ব্যাপারটা জ্যামিতিতে ভারী গোলমেলে। কিন্তু সংজ্ঞা না দিই, কাজ চালানো গোছের কিছু একটা তো বলতে হয়। সেটা আমরা বলব, কিন্তু তার আগে আমাদের অন্য একটা জিনিস একটু বুঝে নিতে হবে। অঙ্কে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ: জ্যামিতির বীজগাণিতিকরণ। ঘাবড়ে যাওয়ার কিচ্ছু নেই, জিনিসটা আমাদের বেশ পরিচিত – স্থানাঙ্ক জ্যামিতি (coordinate geometry)। আর একটুখানি ভেক্টর বীজগণিত।

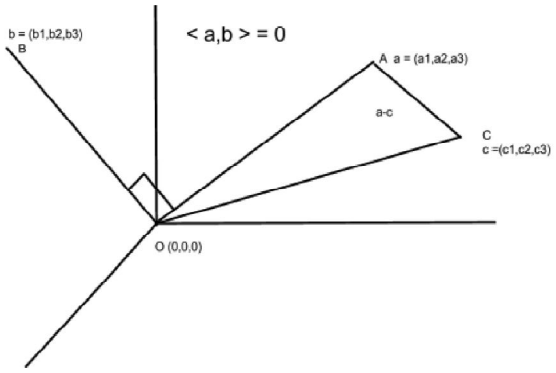

বোঝার সুবিধের জন্য ধরুন, আমরা আছি R^3 তে, মানে ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় স্থানে। এই স্থানে যেকোনো একটা বিন্দুর অবস্থান আমরা তিনটে বাস্তব সংখ্যা দিয়ে বলতে পারব, যেখানে প্রথমটা x কোঅর্ডিনেট-, দ্বিতীয়টা y আর তৃতীয়টা z। ওপরের ছবিতে এরকম তিনটে বিন্দু দেখছি আমরা, A, B আর C। আচ্ছা, OA সরলরেখার দৈর্ঘ্য কত? উত্তর আমরা জানি, $OA^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$। একই ভাবে, $OB^2 = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2$, $OC^2 = c_1^2 + c_2^2 + c_3^2$, আর $AC^2 = (a_1 - c_1)^2 + (a_2 - c_2)^2 + (a_3 - c_3)^2$। আমরা আগে এই ফর্মুলাটাকে সুন্দরভাবে লিখে ফেলি। n দিয়ে লিখব কারণ n এর জন্যেও একই ফর্মুলা,

$$(d(a,b))^2 = (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \cdots + (a_n - b_n)^2$$

এইটাই আমাদের তিন নম্বর স্বতঃসিদ্ধের আলোচনায় বলা স্কেল। এর নাম ইউক্লিডিয় দূরত্ব অপেক্ষক (euclidean distance function)। এর বেশ কিছু মজার চরিত্র আছে:

- $d(a,b) \geq 0$, আর $d(a,b) = 0$ একমাত্র তখনই হবে যদি $a = b$ হয়।
- $d(a,b) = d(b,a)$
- $d(a,c) \leq d(a,b) + d(b,c)$, এইটার নাম ত্রিভুজ অসমতা বা triangle inequality [৬]।

স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ভাষায় স্কেল কি, তা আমরা বুঝলাম। কিন্তু চাঁদা? আমাদের অনেকেরই মনে পড়বে ফিজিক্সে পড়া ডট প্রডাক্টের কথা।

a আর b এই দুই ভেক্টরের ডট প্রডাক্ট বা স্কেলার প্রডাক্ট বা ইনার প্রডাক্ট (inner product) হল $(a,b) = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$

a ও b এর পরস্পরের লম্ব হওয়া (যার মানে OA আর OB সরলরেখাদ্বয়ের পরস্পরের লম্ব হওয়া) আর $(a,b) = 0$, এই দুটো কথা একদমই তুল্যমূল্য (equivalent)। আরও কিছু জিনিস সত্যি এই আপাত অদ্ভুত প্রডাক্টটার ক্ষেত্রে:

- $(a,a) = d(0,a)^2 = |a|^2$ দ্বিতীয় সমতাটিকে শুধু লেখার সুবিধার্থে করা নামকরণ ভাবতে পারেন। অথবা ভাবতে পারেন, ওটা a ভেক্টরের দৈর্ঘ্য বা মান। অঙ্কের ভাষায় যাকে বলে a এর নর্ম (norm of a)
- $(a,b) = |a||b|cos\theta$, যেখানে θ ওই দুই ভেক্টরের মধ্যে উৎপন্ন কোণ।
- $(d(a,b))^2 = (a-b, a-b)$

এই শেষেরটা খুব জরুরী, কারণ ওইটা বলছে কোণ মাপার চাঁদাটা দিয়ে দিলেই দূরত্ব মাপার স্কেলটাও পেয়ে যেতাম। তার আগেরটা অবশ্যই বলছে যে এই চাঁদাটা পুরোদস্তুর চাঁদা, যেকোনো কোণই মাপতে পারে, শুধু সমকোণ নয়।

তাহলে এখনো অবধি কি দাঁড়ালো? ইউক্লিডের প্রথম চারটে স্বতঃসিদ্ধ আমাদের দিল ইউক্লিডিয়ান স্পেস আর এই ইনার প্রডাক্টটা? ঠিক তাই !!

বিশ্বাস না হলে কষে দেখতে পারেন: দ্বিমাত্রিক ইউক্লিডীয় সমতলে, মানে R^2-তে, শুধুমাত্র ইনার প্রডাক্টের ফর্মুলাটা ধরে নিলেই স্কুলে করা দ্বিসামতলীয় জ্যামিতিটা (plane geometry) সব উপপাদ্য-রাইডার সমেত শুধু হিসেব কষায় দাঁড়িয়েছে। আর কিচ্ছু লাগবেনা।

পরের পর্বে আমরা যাব সবচেয়ে ধাঁধালো পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধটায়।

(চলবে)

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] ইউক্লিড, বা ইউক্লিড অফ আলেকজান্দ্রিয়া একজন গ্রীক গণিতজ্ঞ, খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩-২৮৩ এই সময়কালে সক্রিয় ছিলেন বলে জানা যায় । Elements নামে তার লেখা একটি বিখ্যাত বইতেই আমরা স্কুলে যে সব জ্যামিতি করেছি সেই সবটা তো বটেই, বস্তুত বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়া পর্যন্ত মানুষ জ্যামিতি সম্পর্কে যা কিছু জানত, সেই সবটাই লিখিত আকারে প্রথম পাওয়া যায়, যদিও এত গোছানোভাবে না হলেও এই বইয়ের অনেক কিছুই এর আগের যুগের গণিতজ্ঞরা জানতেন, বিশেষত ভারতীয় ও আরব গণিতজ্ঞরা – ফলত এই বইটি মূলত একটি সংকলন... তবে বলে রাখা ভাল যে একান্তভাবেই ইউক্লিডের নিজের অবদান এরকম বহু কিছুই এই বইতে আছে বলেই মনে করা হয় – আর তা ছাড়া এত যৌক্তিকভাবে সাজানো, স্পষ্টভাবে লেখা এই বই যে শুধুমাত্র সংকলন হলেও ইউক্লিডের প্রতিভার মৌলিকত্বের দাবি একটুও কমে না। মানব সভ্যতার

ইতিহাসে মানুষের চিন্তাশক্তির সর্বকালের সেরা কৃতিত্বগুলোর মধ্যে একটা এই বই ।

[২] বইয়ের প্রথমে ওই সংজ্ঞাগুলো সে কারণে অনেকেই মনে করেন যে ইউক্লিডের নিজের দেওয়া নয়, হেরন নামে আর একজন গণিতজ্ঞ বা তার কোন ছাত্রছাত্রী পরে এলিমেন্টস এ ওইগুলো জুড়ে দেন, তবে এ মত বিতর্কিত।

[৩] ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় পাশ (Moritz Pasch) এর বই Vorlesungen über neuere Geometrie (বইয়ের নামের ইংরাজি তর্জমা lectures on modern geometry)। পাশ এই বইতে ইউক্লিডের জ্যামিতিকে সঠিক যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন, primitives এর ধারণাও ওনারই দেওয়া। এই বইটির প্রভাব কত ব্যাপক আজকের ম্যাথেমেটিক্সে সেটা বোধহয় শুধু এইটুকু বললেই বোঝা যাবে যে এই বই পিয়ানোর (Giuseppe Peano) কাজকে প্রভাবিত করেছিল – শুধু জ্যামিতি নয়, গোটা অঙ্কশাস্ত্রের যৌক্তিক ভিত্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ এই বই।

[৪] ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হিলবার্টের (David Hilbert) বই grundlagen der geometrie (বইয়ের নামের ইংরাজি তর্জমা foundations of geometry) অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলা সাড়াজাগানো একটি বই।

[৫] হিলবার্টের grundlagen der geometrie বই তে হিলবার্ট এই স্বতঃসিদ্ধগুলোকেও ঢেলে সাজিয়েছিলেন, এবং আরও অনেকেই এ কাজ করেছেন প্রায় কাছাকাছি বা পরবর্তী সময়ে, যেমন Mario Pieri, G.D. Birkhoff, Oswald Veblen, Alfred Tarski এবং আরো অনেকে। কিন্তু এই কাজগুলো সবই ইউক্লিডের জ্যামিতি বা তার অংশবিশেষ পাওয়ার জন্যে লেখা axiomatic system. আলাদা স্বতঃসিদ্ধ হলে আলাদা জ্যামিতির আলোচনায় আমরা ফিরে আসব।

[৬] এইটা Elements এ একটা উপপাদ্য আসলে: ত্রিভুজের দুটি বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখক স্বর্ণেন্দু শীল ইকোল পলিটেকনিক ফেডেরাল দে লসান-এ ডিফারেনশিয়াল ইক্যুয়েশন নিয়ে গবেষণা করেন। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জীনিয়ারিং এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (ব্যাঙ্গালোর) থেকে অঙ্ক নিয়ে পড়াশুনো করেছেন।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন

https://bigyan.org.in/2014/11/04/jyamitir_gorar_katha/

প্রচ্ছদের ছবিটির উৎস: উইকিপিডিয়া

দূষিত বায়ু দূত হয়ে যায় দূরের দূর্বা ঘাসে

পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

দিল্লীতে বায়ুদূষণের মাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছে দূষণ মাপার স্কেলের সর্বোচ্চ সীমাকে! কলকাতাও খুব দূরে নেই।

জগন্নাথদা গত শনিবার সকালে ফোন করেছিল। তিন বছর হয়ে গেল জগন্নাথদার সঙ্গে পরিচয়। বরাবর বেশ শান্ত স্বভাব আর ব্যক্তিত্বপূর্ণ হাবভাব। আজ কেন জানি না বেশ ক্ষিপ্ত মনে হল। ফোন তুলে বললাম "কি খবর জগন্নাথদা, এতদিন পর ফোন করলে?"

এতদিন ফোন না করার জন্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া তো দূরে থাক, জগাদাকে বেশ রাগী শোনালো, "এখানে মানুষ বাস করে? এরা মানুষ? তুই বল শান্তনু।"

"কেন, কি হয়েছে জগাদা? কাদের কথা বলছ?"

"দেশটা নরকে পরিণত হতে চলেছে আর এরা কিনা মোচ্ছব করছে। এতদিন ধরে বলছি যে বিটি রোডের ধারে এই জঞ্জাল এখুনি পরিষ্কার করা দরকার অথচ শুনছেই না কেউ।" জগাদার গলা দিয়ে হতাশা আর রাগ দুটোই ঝরে পড়ছিল।

তক্ষুনি বুঝলাম জগাদা কি বলতে চাইছে। দীপঙ্করের সাথে ক'দিন আগে যখন দেখা হলো তখন ও বলছিল যে জগাদা রীতিমত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে স্থানীয় পুরপারিষদকে এই বিষয় নিয়ে। দুর্ভাগ্য এই যে তিনি জগাদার কথা বিশেষ কানে তোলেননি। নেহাৎ জগাদাকে লোকজন শ্রদ্ধা করে বলে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন নি। জগাদার কথা শুনে মনে

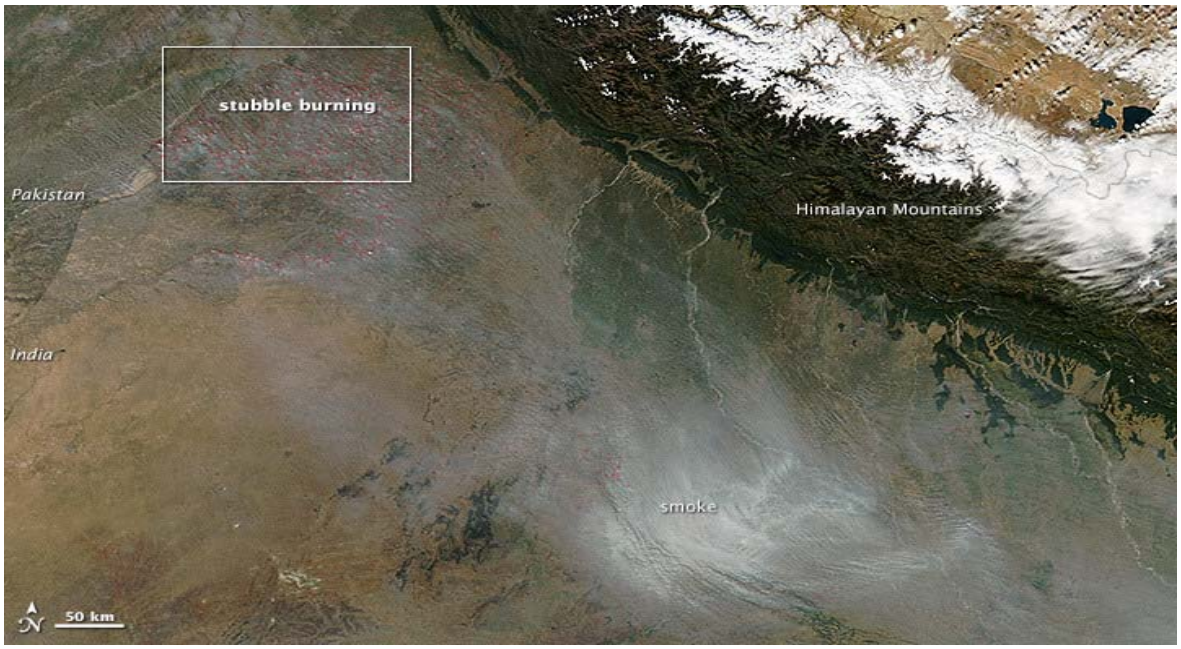

দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবশিষ্ট ফসল পোড়ানোর জন্য দূষণের আন্তরীক্ষ দৃশ্য। ছবির উৎস : উইকিপিডিয়া

হলো আমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে হালকা হতে চাইছে। "আমাদের" বললাম কারণ আমি জানি ও খালি আমাকেই ফোন করে ক্ষান্ত হবে না, একে একে দীপঙ্কর, বিশ্বজিৎ, চন্দন সবাইকেই বলবে একই কথা। বিকেলবেলা সবাই মিলে চলে গেলাম জগাদার বাড়ি।

সবাই মিলে চা খাচ্ছি, এমন সময় জগাদা আসল কথাটা তুলল।

"বিটি রোডের ওপর দিয়ে তোরা এলি, আশেপাশে তাকাস নি?" জগাদার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি একে একে আমার, দীপুর আর বিশুর ওপর পড়ল। আমরা সবাই মাথা নাড়ালাম।

"সত্যি, কি অবস্থা! এই জঞ্জাল থেকে কি পরিমাণ দূষণ ছড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। এর মধ্যে পুরসভা জঞ্জাল পরিষ্কার না করে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া বাতাসে ছড়াচ্ছে ২.৫ মাইক্রোমিটার ব্যাসের কণাকার পদার্থ (particulate matter), যা আমাদের ফুসফুসের নানা অসুখের কারণ। এরকম পরিবেশে থাকলে ধূমপান করো আর নাই করো, ক্যান্সার হবেই আমাদের।" এক নিশ্বাসে নির্মম সত্যটা বলে গেল বিশু[১]।

বাতাসে শুধু ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণে দিল্লি বেইজিং-এর চেয়ে কমপক্ষে ৩ গুণ আগে।
"তোদের যদি জিগ্যেস করি বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর কোনটা তাহলে কি বলবি?" জগাদা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে।

"বেইজিঙ নিশ্চয়।" আমি বলে উঠলাম।

"তোর মত অনেকেই হয়ত বলবে বেইজিঙের কথা। বাস্তবে দিল্লি বহু মাপনীতেই বেইজিঙকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।[২] শুধু যদি বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ দেখিস তাহলে দিল্লি কমপক্ষে প্রায় ৩ গুণ আগে।" বলতে বলতে জগাদা উঠে

পড়ল। নিয়ে এলো ওর একটা ডায়েরি। নানারকম আঁকিবুকি কাটে এখানে। জগাদার কাছে যা শুনলাম তার সবকিছু এখন ঠিক মনে নেই তবে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ সূচক ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে গেলাম তার অনেকটাই (নিচে ছবি দেওয়া হলো সেখান থেকেই)।[৩] দিল্লির বাতাসে ২.৫ মাইক্রোমিটার ব্যাসের কণাকার পদার্থ গ্রহণযোগ্য মাত্রার (৪০ – ৭০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার) থেকে প্রায় ৭ গুণ বেশি। এছাড়া নিচের ছবিটা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে দিল্লির বাতাসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এখনি ব্যবস্থা না নিলে দিল্লিবাসী ভীষণ অসুস্থ হবেন ভবিষ্যতে। এভাবে চললে দিল্লি হয়ত আর বাসযোগ্য থাকবেও না। সত্যি কথা বলতে এখনই দিল্লি আর বাসযোগ্য নেই, অন্তত শীতকালে তো বটেই।

"আমাদের মুখে দিল্লির নিন্দামন্দ শুনে যদি কোনো কলকাতাবাসী ভাবেন যে তিনি স্বর্গে আছেন তাহলে মারাত্মক ভুল করবেন। গাড়ির ধোঁয়া থেকে প্রচণ্ড দূষণ তো হচ্ছেই, তার ওপর জগাদা যা নিয়ে এত চেঁচামেচি করলো সেই জঞ্জাল পোড়ানো কলকাতায় বেড়েই চলছে।" বিশু বলে চলল। জগাদাকে দেখলাম বেশ জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বিশুকে সমর্থন করলো। পরে বাড়ি এসে একটু ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখলাম সত্যি কলকাতার অবস্থা কি রকম। এমনিতেই রাস্তায় বেরোলেই বোঝা যায় কলকাতার বাতাস কতটা দূষিত। বিশেষ করে শীতকালে কলকাতার আকাশ সর্বক্ষণের জন্য ধোঁয়াশায় ঢেকেই থাকে। কলকাতাকে অনেক পরিবেশবিদ সবচেয়ে দূষিত বলে ঘোষণা তো করেই দিয়েছেন। দুর্গাপুর, আসানসোল, হাওড়ার মত শিল্পাঞ্চলগুলোর বাতাসের মানও বেশ খারাপ।[৪] বিশ্বের বহু শহরের তুলনায় কলকাতার মানুষ ফুসফুসের রোগে ভুগছেও অনেক বেশি।[৫]

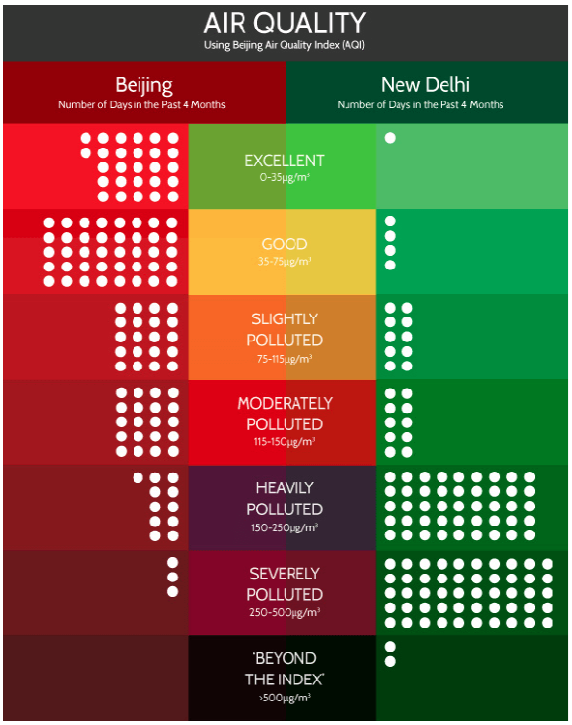

"শুধু এখানকার পুরসভাকে দোষ দিলেও চলবে না, সরকারই বা কি করছে?" জগাদার গলায় ঝাঁঝ।

চন্দন বলে উঠলো, "দিল্লিতে তাও তো কিছুটা গাড়িদূষণ রোধ করার একটা চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সরকার কবে একটা কড়া আইন বানাবে? ভারত ৪–এর মানদণ্ড[৬] মেনে যে গাড়ি চালাবে না তাকেই কড়া শাস্তি পেতে হবে আর যারা মেনে চলবে তাদের পুরস্কার দিতে হবে। এখনো কলকাতায় কত বাস, ট্যাক্সি চলছে মিশকালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।"

"অথচ এমন তো নয় যে চেষ্টা করলে অবস্থা পাল্টানো যায় না। দিল্লিতে জোড়–বিজোড় গাড়ির নীতি[৭] চালু করে ইতিমধ্যেই কিন্তু কিছু ফল পাওয়া

যাচ্ছে মনে হচ্ছে।[৮]” বিশু আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করলো।

আমি একটু সন্দিহান ব্যাপারটায়, তাই বললাম, “সেটা অবশ্য এখনি নিশ্চিত ভাবে বলা মুশকিল কারণ আমাদের দেশের মানুষ গাড়িদূষণ না করতে পারলে অন্য কিছু করে ঠিক আশ মিটিয়ে নেবে। বিক্ষোভ মিছিলে টায়ার পুড়িয়ে যে কি আনন্দ পায়, দেখিস নি? তবে দিল্লিতে মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে।[৯]”

এবার জগাদার ইতিহাস জ্ঞানের আর একটা নিদর্শন পেলাম। “নিক্সনকে যতই লোকজন ঘৃণার চোখে দেখুক না কেন, একটা ভালো কাজ উনি করেছিলেন। আমেরিকার নির্মল বায়ু আইন (clean air act) তিনিই পাশ করান সেই সত্তরের দশকে আর আজ দ্যাখ মার্কিন দেশের শহরগুলোর বাতাস অনেকটাই পরিষ্কার। অথচ একটা সময় আমেরিকার অনেক শহর আজকের দিল্লি বা বেইজিঙের মতই ধোঁয়াশায় ঢাকা থাকত।[১০] ভারত সরকার গাড়ির ধোঁয়া থেকে দূষণ রোধ করার জন্য যে মাপকাঠি ঠিক করেছে সেটা কিন্তু যথেষ্ট কঠোর, বস্তুত ইউরোপের মাপকাঠির থেকেই অনুপ্রেরিত। এটাই যদি সঠিকভাবে সরকার প্রয়োগ করে তাহলেই সমস্যা অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব।[১১] “আচ্ছা জগাদা, একটা কথা বলো যে পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে দূষণ নিয়ে গবেষণা এবং নীতি প্রণয়ন নিয়ে কাজ হয় সেভাবে ভারতে কি হয় আদৌ?” চন্দন আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিগ্যেস করলো।

“চেষ্টা হয়। তবে কি জানিস তো, পরিচালনার কিছু সীমাবদ্ধতা, আর্থিক বাধা এসব কাটিয়ে খুব ভালো গবেষণা করা হয়ে ওঠে না এদেশে। এর মধ্যে আইআইটিগুলো কিছুটা উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি আইআইটি কানপুরের নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছে ভারতের নিজস্ব বায়ুদূষণ সূচক (National Air Quality Index, NAQI) কিন্তু এখনো বিষয়গুলো নিয়ে তেমন স্বচ্ছতা নেই তাই অনেক প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে।[১২] চীনে ওদের নিজস্ব সূচক তৈরি হয়েছে বেশ কয়েক বছর হলো।[১৩] ওরা যথেষ্ট ভালোভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে যেটা আমাদেরও করতেই হবে নাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসবে না। এর জন্যে বেসরকারি উদ্যোগেরও ভীষণ দরকার। এই জায়গায় আমরা একেবারেই যথেষ্ট এগোতে পারছি না। কলকাতাতেই দূষণ পরিমাপের যন্ত্র নেই যথেষ্ট, থাকলেও সেগুলো বিকল হয়ে পড়ে থাকে।[১৪] অনেক তথ্যই পাওয়া যায় মার্কিন দূতাবাসের কাছ থেকে।[১৫]” একনাগাড়ে বলে গেল জগাদা।

একটা সময় আমেরিকার অনেক শহর আজকের দিল্লি বা বেইজিঙের মতই ধোঁয়াশায় ঢাকা থাকত। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি চাকরি পেয়েছে পুণের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিকাল মেটিওরোলজিতে (Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM Pune), তাই ওদের কাজ সম্পর্কে একটু জানতাম। সেই সদ্যলব্ধ জ্ঞান বিনামূল্যে বিতরণ করে দিলাম এই সুযোগে।

“তোমরা সফর (SAFAR) বলে কোনো উদ্যোগ শুনেছ কিনা জানি না তবে পুণের আইআইটিএম (IITM) এই ব্যাপারে গবেষণা করছে যার নাম দিয়েছে সফর এবং ওরা পুণে, মুম্বইয়ের আশেপাশে বায়ুদূষণের ওপর নজর রাখছে।[১৬]”

“সে তো পশ্চিমবঙ্গেও সরকারের এরকম ব্যবস্থা আছে কিন্তু আরও যন্ত্র বসানো খুব জরুরি। শুধু তাই

নয়, সাধারণ মানুষকে সর্বক্ষণ জানানোটাও খুব দরকার।[১৭]" জগাদার কাছে সব খবরই আছে বুঝলাম। তবে জগাদা ছাড়া আর কেউ জানত না সেটা বুঝতে পেরে একটু গর্বিত হলাম মনে মনে। "কবে কলকাতার আকাশ ঘন নীল দেখব জগাদা? কবে আমরা সবাই পরিবেশ সচেতন হব?" চন্দন নিরাশভাবে প্রশ্ন করলো।

"হবে হয়ত কোনদিন, আমি দেখে যেতে পারব না বোধহয়।" জগাদার হতাশা ঝরে পড়ল।

কথাটা আমাদের কারোর ভালো লাগলো না, কিন্তু কেউ কিছু বললাম না। হয়ত আমরাও ভাবছি যে আমাদের মৃত্যুর আগেও হবে কিনা।

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ মার্চ ২১, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

পদক্ষেপ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2017/07/10/dirac_equation_in_graphene/

প্রচ্ছদের ছবির উৎস : উইকিপিডিয়া

তথ্যসূত্র :

[১] কণাকার পদার্থ সম্পর্কে চট করে জেনে নিন: https://youtu.be/nnoGUVBUiGM
[২] https://www.weforum.org/agenda/2015/06/which-is-the-worlds-most-polluted-city/
[৩] ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ: http://epi.yale.edu/country/india
[৪] http://goo.gl/3gslpG
[৫] http://www.theicct.org/sites/default/files/MRay_0.pdf
[৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Bharat_Stage_emission_standards
[৭] https://en.wikipedia.org/wiki/Road_space_rationing#New_Delhi
[৮] https://epic.uchicago.edu/news-events/news/yes-delhi-it-worked
[৯] http://goo.gl/a6oDPI
[১০]https://epic.uchicago.edu/news-events/news/infographic-cleaner-air-longer-lives
[১১] http://cpcb.nic.in/Vehicular_Exhaust.php
[১২] http://cpcb.nic.in/National_Ambient_Air_Quality_Standards.php
[১৩] চীনা উদ্যোগ যা ভারতের কণাকার পদার্থের হিসেবও রাখছে: http://aqicn.org/map/india/
[১৪] http://goo.gl/vgJSsX
[১৫] http://kolkata.usconsulate.gov/airqualitydataemb.html
[১৬] http://safar.tropmet.res.in/AQI-47-12-Details
[১৭] http://emis.wbpcb.gov.in/airquality/showprevdata.do

অকাজের বিজ্ঞান, কাজের আবিষ্কার

সুপ্রতীক পাল

|| প্রাককথন ||

প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল কী একটা বিকট আরক বানানোর কাজে ইদানিং ভয়ানক ব্যস্ত। তাই তিনি এবার শিখিয়ে-পড়িয়ে বিজ্ঞানের দরবারে পাঠিয়েছেন ব্যাকরণ সিংকে।

এদিকে উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চড়তেই "তবে রে ইসটুপিড উধো" আর "তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো" বলে দুই বুড়ো তো লেগে পড়ল ঝটাপট, খটাখট, দমাদম, ধপাধপ !

বুড়ো হাড়ে এতো অত্যাচার সইবে কেন?

খানিক বাদেই উধো উঠে কান্না জুড়ল, "ডাক্তার দেখাব ! এম! করাব .আই.আর."

তা এমআগে দেখতে হবে ! যে বাজারে গেলাম আর কিনে নিয়ে এলাম ! তো আর হাতের মোয়া নয় .আই.আর. কোথায় হয়। খোঁজ করতে উধো বসল .আই.আর.য় আর ভালো এমভালো ডাক্তার কোথায় পাওয়া যা ইন্টারনেটে।

খোঁজ যদিও বা পাওয়া গেল, যাবে কিভাবে? থাকে তো তারা গাছের ফোকরে।

"চিন্তা কিসের? সেদিন গেছোদাদাকে খোঁজার জন্য যে স্মার্টফোন কিনলাম, ওতে জিআছে না .এস.পি.? চোখ রেখে ঠিক পৌঁছে যাবো দুজনে।" বললো বুধো।

পথে দুই ভাইয়ের হঠাৎ দেখা ব্যাকরণ সিং-এর সাথে। সে তখন দাড়ি নেড়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে...

|| মূলপর্ব ||

হে বালকবৃন্দ ও স্নেহের হিজিবিজবিজ, আজ আমি যে-বক্তৃতা আপনাদের সামনে দিতে চলেছি, তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়: "মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা করে কী হবে মশাই?" প্রথমেই যা জানা দরকার, তা হল বিজ্ঞান কয়প্রকার ও কী কী? বিজ্ঞান দুই প্রকার : এক, ব্যবহারিক বা ফলিত বিজ্ঞান, যাকে আপনারা বলেন Applied Science, যার সাহায্যে আপনি আলো জ্বালান, এসি চালান, ফেসবুক করেন। আর দ্বিতীয়টি হল মৌলিক বিজ্ঞান অর্থাৎ Basic Science, যার মূল উদ্দেশ্য কোনোরকম প্রয়োগের কথা আগেভাগে চিন্তা না করে শুদ্ধ জ্ঞানলাভ। আরো খোলসা করে বললে, আমাদের কাছে-দূরের জগৎ সম্বন্ধে 'কী', 'কেন', 'কিভাবে' এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাই মৌলিক বিজ্ঞান শিশি-বোতলের মতোই শক্ত লাগে।

যেমন ধরুন কেশব নাগের অঙ্ক। তৈলাক্ত বাঁশে এক বাঁদর উঠছে আর নামছে। আপনি নির্ঘাৎ বলবেন, "দূর ছাই! খামোখা বিচিত্র তৈলাক্ত বাঁশের কল্পনায় জীবন দুর্বিষহ করে লাভ কী? তার চেয়ে বরং এসিটা চালিয়ে আরামে ফেসবুক করি গে'।" আজ আমি আপনাদের যা বলব, তার মূলকথা এটাই : বিশ্বাস করুন আর ছাই না-ই করুন, আপনাদের আরাম-আনন্দ-আরোগ্যের বীজ লুকিয়ে রয়েছে ঐ বিচিত্র ও আপাত বেকার বিজ্ঞানচর্চার মধ্যেই। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বেশ, তবে শুনুন!

এই যে উধো আর বুধো, চললে কোথায়? বুড়ো হাড় মচকেছে বুঝি? এম.আর.আই .করাবে? তা যাবে বৈকি ভায়া, নিশ্চয় যাবে। সত্যিই তো, ভাবুন দেখি, চিকিৎসাবিদ্যা আজ কত এগিয়েছে ! আপনাদের শরীরের ভেতরে যেসব কলকব্জা, সেখানেও কী চক্কর চলছে, তা এক লহমায় বলে দেওয়া যাচ্ছে এক্স-রে কিংবা এম.আর.আই .করে। এক্স-রে-র কথা নাহয় বাদই দিলাম, তার গল্প তো আপনারা ছোটবেলায় পড়েছেন। জানেন কি, এই এম.আর.আই.-এর আসল নাম? Magnetic Resonance Imaging। Imaging মানে তো আপনার কাছে জলের মতো পরিষ্কার — 'ছবি তোলার কল'! আর প্রথম দুটো শব্দ আসে NMR অর্থাৎ Nuclear Magnetic Resonance থেকে!

MRI-এর সাহায্যে আপনাদের শরীরের কোনো বিশেষ অংশের ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে ফেলা যায় নিমেষে ছবির উৎস): উইকিপিডিয়া)

আহাহা, 'Nuclear' শুনেই ঘাবড়ালেন নাকি? তা আপনাদের আর দোষ কী? আপনারা ঘাবড়ে যাবেন বলেই-না NMR থেকে N-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে আসল কথাটি হল, আপনাদের চিকিৎসার সুবিধের জন্য মোটেই বস্তুটি আবিষ্কার হয়নি। এন.এম.আর .আবিষ্কার করেছিলেন এডওয়ার্ড পার্সেল আর ফেলিক্স ব্লক নামে দুজন পদার্থবিজ্ঞানী। তাঁরা খুঁজে পান পর্যায়সারণী অর্থাৎ Periodic table-এর কিছু বিশেষ নিউক্লিয়াসের চৌম্বকীয় ধর্ম। এই ধর্মের নাম চৌম্বকীয় অনুনাদ বা Magnetic Resonance। সেজন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যান তাঁরা সেই ১৯৫২ সালে।

আপনাদের আরেকটু ঘাবড়ে দিয়ে বলি, ঐ বিশেষ নিউক্লিয়াসগুলি মূলতঃ তেজস্ক্রিয় মৌল বা radioactive element-এর[১]। বহু পরে এই নিউক্লিয় চৌম্বকীয় অনুনাদকে কাজে লাগিয়ে তৈরী হয় এক বিশেষ ধরণের 'ছবি তোলার কল' (imaging technique)। এই খুড়োর কলটির বৈশিষ্ট্য হল এর সাহায্যে আমাদের শরীরের কোনো বিশেষ অংশের ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে ফেলা যায় নিমেষে[২]। হ্যাঁ, ত্রিমাত্রিক – দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা সমেত। এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। জানেনই তো, এক্স-রে তে পাওয়া যায় দ্বিমাত্রিক ছবি। তাই আজকাল ডাক্তারবাবুরা বলেন, এক্স-রের চেয়ে এম.আর.আই.তে আরো নিখুঁতভাবে জানা যায় শরীরের ভেতরের কলকব্জা। তবে শুনে আপনাদের দুঃখ হবে ঠিকই, সত্যি বলতে কী, এই মৌলিক বিজ্ঞানচর্চায় কোথাও চিকিৎসাবিদ্যায় প্রয়োগের উদ্দেশ্যই ছিল না। নেহাৎই অজানাকে জানার আনন্দে তাঁরা আবিষ্কার করেন এই বিশেষ চৌম্বকীয় অনুনাদ। কিন্তু কী আশ্চর্য বলুন ! ঐ নিখাদ নির্ভেজাল জানার আনন্দের 'তৈলাক্ত বাঁশ'টুকু না থাকলে যে আজকের দিনে উধো-বুধো পড়ত মহা ফ্যাসাদে !এন.এম.আর .না থাকলে আর এম.আর.আই.-টা হতো কিভাবে?

আরে রামো! Radioactive element নিয়ে কত্ত কথা বললাম এতক্ষণ। খেয়ালই নেই, রেডিওলজি (radiology) কথাটা তো আপনারা আকছারই শুনে থাকেন আজকাল। চিকিৎসার কতো ক্ষেত্রেই তো তার প্রয়োগ। মায় রেডিয়েশন থেরাপি দিয়ে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা অব্দি। তা এই radioactivity বা তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারকদের নাম তো আপনারা দিব্যি জানেন। একদম ঠিক ধরেছেন, মেরি ক্যুরি আর পিয়ের ক্যুরি [৩]। দুজনেই রসায়নবিদ। তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম ও পলোনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন নিখাদ নতুন কিছু জানার আনন্দে। শোনা যায় পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন সেই মৌল [৪], যাতে আমার-আপনার মতো ছাপোষা লোকদের দেখিয়ে সে-আনন্দে সামিল করা যায়। তার খেসারতও দিতে হয়েছিল অবশ্য হিসেবমাফিক। দু-দুটো নোবেলের পর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে দুরারোগ্য রোগ অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়ার (Aplastic Anemia)-র খপ্পরে পড়েন মেরি ক্যুরি।

তা আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, "এরকম মারণ আবিষ্কার না করলেই কি চলতো না?" চলতো না মশাই, চলতো না। নতুনকে জানার আনন্দ যে অপার! সে আনন্দের নেশাতেই তো আপনি বেরিয়ে পড়েন কলম্বাসের রূপ ধরে ডিঙি নৌকায় চড়ে পৃথিবী পরিক্রমায়, কিংবা তেনজিং-হিলারি হয়ে হানা দেন দুরূহ এভারেস্টে। কিন্তু ভাবুন একবার, সেই মারণ আবিষ্কারই কিনা আজ কাজে লাগছে মারণ রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসায় রেডিয়েশন থেরাপি হয়ে! কী আশ্চর্য! ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল! কিভাবে জানেন? মৌলিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা করতে গিয়েই জানা গেছে ঠিক কী কৌশলে নিখুঁতভাবে (controlled way) তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রয়োগ করা যায় - যা মানবশরীরে ঢুকে শুধুমাত্র ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী দুষ্ট কোষগুলোকেই নিখুঁত নিশানায় আক্রমণ করে মেরে ফেলে [৫]। ভাবুন দেখি একবার কাণ্ডটা! তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সময় কি কেউ এইসব ভেবে এগিয়েছিল? এক্কেবারেই না !!

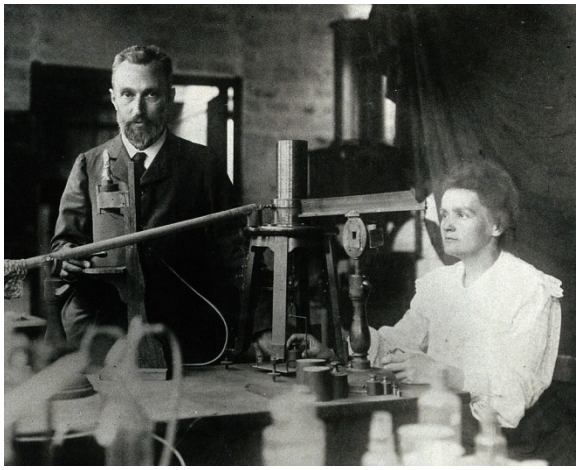

তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম ও পলোনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন দুজন রসায়নবিদ - মেরি ক্যুরি আর পিয়ের ক্যুরি ছবির উৎস): উইকিপিডিয়া)

নির্ঘাৎ ভাবছেন, "দু-একটা এরকম মিলে যেতেই পারে। আসলে এসব ভাগ্নে চন্দ্রখাইয়ের আষাঢ়ে গপ্পো!" তাই তো? এই যে ভায়া বুধো, ভাইয়ের কানে কী যেন বলছিলে ফিসফিসিয়ে? "আজকালকার ডাক্তারদের কথা আর বলিস না। হুট করতেই বলে এই পরীক্ষা করাও, ঐ পরীক্ষা করাও। দাঁড়া, একটু ইন্টারনেটে বসে দেখে নি ব্যাপারখানা।" তা এই যে আন্তর্জাল বা internet — কম্পিউটার রাখুন, আপনাদের পকেটের স্মার্টফোনেই তো দিব্যি ফোর-জি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখছি। কোনো নতুন ওয়েবসাইট খুলতে হলেই টুক করে লিখে ফেলছেন "www" — তা এই www বা World Wide Web-এর জন্ম কিভাবে জানেন? ব্যবহারিক জগতে নিতান্ত অপদার্থ কণাপদার্থবিদ্যা (Particle Physics)-র কাজ করতে গিয়ে।

গল্পটা তাহলে খুলেই বলি। মৌলিক বিজ্ঞানের তখন রমরমা। এক এক করে আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন মৌলিক কণা (elementary particle)। হুহু করে বাড়ছে নানান তথ্য। সাথে বাড়ছে ইউরোপের জেনিভা শহরের পাহাড়ের তলায় তৈরী জগৎবিখ্যাত ল্যাবরেটরি সার্ন (CERN)-এ বিপুল পরীক্ষালব্ধ ফল, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে ডেটা (data)। তা সারা পৃথিবী জুড়ে যেসব কণাপদার্থবিজ্ঞানীরা কাজ করেন, তাঁরা তো আর নন্দ গোঁসাই নন, যে হুঁকোহাতে হাস্যমুখে দিনাতিপাত করবেন ! তাঁদের চাই সেই ডেটা, যা বিশ্লেষণ করে তাঁরা আরো অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে যাবেন মৌলিক বিজ্ঞানকে। কিন্তু মুশকিল হল এত এত মাইল দূরে বসে তাঁরা কিভাবে নাগাল পাবেন জেনিভা শহরের ল্যাবরেটরিতে তৈরী সেই ডেটার? সার্ন-এ গিয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকা তো আর সম্ভব না! এদিকে সার্ন-এও তো গুটিকয় লোক। তাঁরাই-বা একা একা কিকরে করবেন এই বিপুল পরিমাণ ডেটার বিশ্লেষণ? মহা ফ্যাসাদ!

মুশকিল-আসান হলেন টিম বার্নার্স-লি নামে এক তরুণ গবেষক। তিনি ভাবলেন, আচ্ছা, মহম্মদ পর্বতের কাছে আসতে না পারলে পর্বতই যদি যায় মহম্মদের কাছে, তাহলে? যেই ভাবা, সেই কাজ! ভাবতে ভাবতে ১৯৮৯ সালে তিনি বানিয়ে ফেললেন এই ডেটা পাঠানোর কল, যে-কলের নাম World Wide Web। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকুন না কেন, এর সাহায্যে এক নিমেষে তাঁদের হাতে পৌঁছে যাবে কণাপদার্থবিদ্যার ডেটা। ইচ্ছেমতো। শুধু তাঁদের কাছে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সুবিধাটুকু থাকতে হবে, ব্যাস ! আর হলোও তাই, হু হু করে এগোতে থাকলো কণাপদার্থবিদ্যার জগৎ। এসবের ফাঁকেই কিন্তু গোলেমালে www থেকে আপনারা পেয়ে গেলেন ইন্টারনেট।

একবার ভাবুন মশাই, সেই ইন্টারনেট — যা কিনা আবিষ্কার হয়েছিল অকর্মণ্য মৌলিক পদার্থবিদ্যা গবেষণা করতে গিয়ে — তার হাত ধরে আপনারা আজ পৌঁছে যাচ্ছেন আপনাদের কাজ-অকাজের সব তথ্যের দোরগোড়ায়, পাঠাচ্ছেন ইমেইল, করছেন অনলাইন লেনদেন, জানছেন বিশ্বের শেষ প্রান্তের নানান তথ্য, করছেন ফেসবুক, ভিডিও কনফারেন্সিং, আরো হাজারো কাজ! কিন্তু এসব করবেন ভেবে তারপর যদি গবেষণাটা শুরু করতে হত, তাহলে তো মশাই তা হয়ে যেত নন্দখুড়োর হাতগণনা!

শুধু কি তাই? সেদিন যে বড় আপনি, আপনার গিন্নী আর আপনার নয় ছেলে — সবাই মিলে ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্র (3D movie) দেখে এলেন মাল্টিপ্লেক্সে, তা এই থ্রী-ডি মুভি দেখতে পান কার সাহায্যে? ফোটন কণিকা — যাকে সহজ ভাষায় আপনারা বলেন আলো — তার এক বিশেষ ধর্ম পোলারাইজেশানের সাহায্যে [৬]। এ গল্প কিন্তু প্রফেসর পাটকেল আগেই বলেছেন "মহাবিশ্বের প্রথম আলো" তে [৭]। ফোটনের পোলারাইজেশান ধর্ম আলোকে দুটি পরস্পর লম্ব দিকে ভেঙে দেয়। আর তা দেখতেও পাওয়া যায়। তবে কিনা খালি চোখে না, বিশেষ চশমায়, যাতে থাকে পোলারাইজার। এই চশমা চোখে পরলেই সাধারণ দ্বিমাত্রিক পর্দা (2D screen) হয়ে পড়ে ত্রিমাত্রিক (3D)। আর আপনারাও দিব্যি দেখতে পান থ্রী-ডি মুভি।

আরো আছে। আজকাল আপনারা কেউ কেউ শোনেন গামা ক্যামেরার কথা (Gamma camera) — যা দিয়ে মস্তিষ্ক, কিডনি, ফুসফুস এসবের স্ক্যান করা হয়। এরও আবির্ভাব গামা-রে নামক অপদার্থ রশ্মির আবিষ্কারের ফলেই-না! এই যে চন্দ্রখাইবাবু, বেজার মুখে এককোণে দাঁড়িয়ে মুঠো মুঠো বাদাম খাচ্ছেন দেখছি। ভাবুন দেখি একবার, আপনার হাতে সে-যুগে এই গামা ক্যামেরা থাকলে বন্দাকুশ পর্বতে চিল্লানোসোরাসের শারীরিক গঠনের ছবিটা টুক করে তুলে ফেলতে পারতেন। চাই কী, টুক করে হোয়াটস্যাপ করে দিতেন সন্দেশের দপ্তরে, নিদেনপক্ষে ড্রপবক্সে ফেলে রাখতেই পারতেন — মৌলিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইন্টারনেট তো আছেই। আপনাকে আর 'গপ্পোথেরিয়াম' বদনামের ভাগিদার হতে হত না।

আর সে-যে দুর্যোগে পড়েছিলেন সেবার, আমরা তো শুনেইছি। ভাবুন দেখি ওরকম দুর্গম জায়গায় যদি একটা হিমবাহ নেমে আসত, তাহলেই চিত্তির ! হিমবাহ চেনেন তো? আমরা যাকে বলি glacier — শুনেছেন, এই হিমবাহভায়া কোন পথে নামবেন তা আগাম আঁচ করা — যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে track করা — তার সম্ভাবনাও নাকি তৈরী হচ্ছে। কার কেরামতিতে জানেন? সেই যে মৌলিক বিজ্ঞানচর্চার এক ভাই কণাপদার্থবিদ্যা — সেই সার্ন-এর কর্মযজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অংশ accelerator-এর কেরামতিতে !

আহা ভাই বুধো, চটো কেন? কি বললে? "আমরা ছাপোষা মানুষ, যাচ্ছি ভাই উধোর ডাক্তার দেখাতে, আমাদের হিমবাহ ট্র্যাক করে কী হবে মশাই?" হক কথা। হিমবাহ না হোক, ডাক্তারের ঠিকানা তো ট্র্যাক করবে? সে উত্তরও রেডি বুঝি? "চিন্তা কিসের? সেদিন গেছোদাদাকে খোঁজার জন্য যে স্মার্টফোন কিনলাম, ওতে জি.পি.এস. আছে না? চোখ রেখে ঠিক পৌঁছে যাবো।" তা যাচ্ছো যাও, তবে শুনেই যাও নাহয় এই GPS বা Global Positioning System এল কোত্থেকে?

সাধারণ অপেক্ষবাদের হিসাব কাজে লাগে পৃথিবীর ঠিক কোথায় কোন জায়গা রয়েছে — বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, দোকানবাজার — এসবের সঠিক বর্ণনায়, অর্থাৎ জিছবির উৎস) এ।.এস.পি.: উইকিপিডিয়া)

সে ভারী মজার কাহিনী। ১৯১৬ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নিয়ে এলেন সাধারণ অপেক্ষবাদ বা General Relativity [৮] — যার সাহায্যে জানা গেলো মহাবিশ্বের অনেক অজানা তথ্য, জন্ম নিলো নতুন নতুন বিস্ময়। কিন্তু এসবই তো ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিহীন মৌলিক গবেষণা। ঘোরতরভাবে তাত্ত্বিক। 'অকর্মণ্য' বলে দূরছাই করতেই পারেন। কিন্তু যদি আপনাকে বলি, এই যে জি.পি.এস., এর গণনা নিখুঁত ও সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়েছে কিসের সাহায্যে জানেন? ঐ সাধারণ অপেক্ষবাদের সাহায্যে। একমাত্র সাধারণ অপেক্ষবাদের সাহায্যেই সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতির নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সে হিসাবই কাজে লাগে এই পৃথিবীর ঠিক কোথায় কোন জায়গা রয়েছে — বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, দোকানবাজার — এসবের সঠিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়, অর্থাৎ জি.পি.এস.এ। আর আপনি তো জানেনই, গেছোদাদাকে খুঁজতে গিয়ে জি.পি.এস.-এর হিসেবে সামান্য ভুলচুক হলেই চিত্তির। উলুবেড় যেতে গিয়ে পৌঁছে যাবেন মোতিহারি। তবে সত্যি কথা হল ঐ। মৌলিক বিজ্ঞানের এই অংশের গবেষণাও হয়েছে শুধুই জানার আনন্দে। আজও তাই হয়। জানা যায় অনেক নতুন নতুন তথ্য, জন্ম হয় নতুন বিস্ময়ের। এরকম কিছু বিস্ময় নিয়ে প্রফেসর পাটকেল তো আগেই ঘুরে গেছেন। "মহাবিশ্বের প্রথম আলো" আর "আকাশজুড়ে এই আঁধারে" পড়েই নিন না-হয় আরেকবার [৭]। কিন্তু মৌলিক বিজ্ঞানের এই চলার পথে ব্যবহারিক দিকগুলো বেরিয়ে আসে আপনাআপনি। ব্যস! কেল্লা ফতে! আপনি তো হাতে পেয়ে গেছেন জি.পি.এস.! যাবেন নাকি মশাই বন্দাকুশ পর্বতের চূড়ায় হেঁসোরাম হুঁশিয়ারির সাথে নতুন অভিযানে?

শুধু কি জি.পি.এস.? ভূসমলয় উপগ্রহ (geostationary satellite), যার সাহায্যে আপনি বাড়িতে বসে দিব্যি দেখছেন স্যাটেলাইট টিভিতে হরেক অনুষ্ঠান, মায় কাল সকালের আবহাওয়াটা কেমন থাকবে তাও দিব্যি জেনে যাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তর থেকে — এককথায় তামাম মহাকাশ প্রযুক্তি (space technology) দাঁড়িয়ে আছে এই তাত্ত্বিক গবেষণার ওপর। আরও আছে। নিউক্লিয় শক্তি দিয়ে যে বিদ্যুৎ তৈরী হয়, এ তো আপনি জানেনই। তাই দিয়ে আপনি আলো জ্বালাতে পারেন, পারেন পাখা-এসি, এমনকি কলকারখানা অবধি। উন্নত দেশে এখনই শুরু হয়ে গেছে এসব। আমাদের দেশে আজ নয় কাল এলো বলে! পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি তো সীমিত! পালাবেন, তার জো আছে?

(কিছুক্ষণ সাহেবের তাঁবু চিবিয়ে, অতঃপর): ভাইসকল, আপনারা জানেন, আমার নাম ব্যাকরণ সিং, BA খাদ্যবিশারদ। সত্যি বলতে কী, আমি ভাবতেও পারি না এরকম কতরকম ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব ! এই তো সেদিন প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের কাছে শুনলাম এসব মৌলিক গবেষণা করতে গিয়ে নাকি নতুন নতুন প্রযুক্তিরই (technology) জন্ম দিতে হচ্ছে, যা নাকি প্রযুক্তিবিদরাও কোনোকালে কল্পনা করেন নি। যেমন ধরুন না, যে মহাকর্ষ তরঙ্গের (gravitational waves) আবিষ্কার নিয়ে সারা বিশ্বে হৈহৈ পড়ে গেছে, তা তো নেহাতই তাত্ত্বিক বিষয়। কিন্তু এই আবিষ্কার করতে গিয়েই গবেষণাগার লাইগো (LIGO)-তে তৈরী করতে হয়েছে এক নতুন প্রযুক্তি — যার নাম ব্যতিচার প্রযুক্তি বা interferometer technology [৯]। এই প্রযুক্তি মার্কিন সংস্থা নাসা (NASA)-র চল্লিশ বছর ধরে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক সাহায্যের ফলশ্রুতি। হ্যাঁ, চল্লিশ বছর! বড় কিছু কাজ করতে তো এটুকু সময় লাগবেই। বিনিময়ে প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতিটাও দেখুন।

আর এই ধরুন, নতুন এক টেলিস্কোপ তৈরির কাজ চলছে পৃথিবীজুড়ে — যার নাম স্কোয়ার কিলোমিটার এরে (Square Kilometer Array: SKA) । জানেন, এতে যতটা অপটিক্যাল ফাইবার লাগবে, তাই দিয়ে আমাদের পৃথিবীকে পাক্কা দুই পাক দিয়ে ফেলা যায়? ফাইবার অপটিক্সের উন্নতি ঠেকায় কে? আর জানেন, এর মূল কম্পিউটারখানি তৈরী করা হচ্ছে আমার-আপনার ঘরে যে আধুনিক কম্পিউটার আছে, সেরকম দশ কোটি কম্পিউটারের সমতুল্য করে? হ্যাঁ, ঐ একটি কম্পিউটারই হবে দশ কোটির সমতুল্য! ভাবুন দেখি কম্পিউটার প্রযুক্তির কী বিপুল উন্নতি ঘটে যাচ্ছে এই ফাঁকে। উদাহরণের কি শেষ আছে মশাই? শুনলাম আর এক টেলিস্কোপ থার্টি মিটার টেলিস্কোপ (Thirty Meter Telescope: TMT) — যার পরিকল্পনা চলছে ইতিমধ্যেই — তার লেন্সের ব্যাস কত হবে জানেন? তিরিশ মিটার! তা এই তিরিশ মিটার ব্যসের লেন্স আদতে কতটা বড়, আন্দাজটা একটু দি। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফাররা ঘাড়ে করে যে-সুবিশাল ক্যামেরা বয়ে বেড়ান, তার লেন্সের ব্যাস হয় মোটামুটি কয়েক ইঞ্চি মাপের। এবার তো জলের মত হিসেবটা পরিষ্কার হয়ে গেল! হিসেব কষলে দেখবেন, TMT-তে যে লেন্সটি ব্যবহার হবে, তা উচ্চতায় একটি দশতলা বাড়ির সমান উঁচু! বুঝুন, কী ভয়ানক হবে ব্যাপারখানা! তবে এই লেন্সটি হবে আসলে বেশ কয়েকটি লেন্সের সমন্বয়ে তৈরী। সবে মিলে তারা তৈরী করবে ঐ তিরিশ মিটার ব্যাসের লেন্সের সমান ক্ষমতা। এতে করে আলোকপ্রযুক্তির উন্নতি ঘটবে অসীম। নেহাৎই অসম্ভব মনে হচ্ছে নাকি? তাহলে জানাই, সাড়ে আট মিটার ব্যাসের টেলিস্কোপ বিজ্ঞানীরা আজকের দিনেই ব্যবহার করেন কিন্তু। আর এসবই হচ্ছে কিনা সেই অকর্মার ঢেঁকি মৌলিক বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে !

এসবের মাঝে ভারতও এগোচ্ছে গুটিগুটি পায়ে। ইসরো (ISRO) তো আছেই, আরো অনেক নতুন বহুদেশীয় উদ্যোগেরও অংশীদার আমরা। “ভারতের মত গরিব দেশে এসব কি বিলাসিতা নয়?” — আপনাদের সাবেকি প্রশ্নটাও তাই নস্যাৎ হয়ে যায় এখানেই। নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে গেছেন একটা দেশকে বিজ্ঞানে উন্নত হতে গেলে ফলিত ও মৌলিক দুই স্তরেই উন্নতি দরকার পাশাপাশি। নিশ্চয় মানবেন, এতে লাভ হয় দুই তরফেরই।

হে বালকবৃন্দ ও স্নেহের হিজিবিজবিজ, আমি আর বেশি সময় নেবো না। উধো-বুধোরও বেলা হয়ে যাচ্ছে। শেষ গল্পটি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ জি.এইচ.হার্ডি-কে নিয়ে — যাঁর নাম উচ্চারিত হয় বিজ্ঞানী রামানুজনের সাথে এক বন্ধনীতে — হার্ডি-রামানুজন তত্ত্বের জন্য। এহেন হার্ডি গর্বভরে বলতেন, “No discovery of mine has made, or is likely to make, directly or indirectly, for good or ill, the least difference to the amenity of the world.” কাষ্ঠগদ্যে বললে, “আমার কোনো আবিষ্কারই কোনোদিন মানবসমাজের কোনো কাজে আসবে না হে বৎস।” আর কিমাশ্চর্যমতঃপরঃ! তাঁরই আবিষ্কৃত সংখ্যা তত্ত্ব (number theory)-এর ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে কিনা আজকের জিনবিদ্যার (Genetics) মতো মহামূল্য ব্যবহারিক দিক, যার সাহায্যে কতশত জটিল রোগের চিকিৎসা হচ্ছে! আপনার হাতের ছাপ দিয়ে যে আপনাকে যায় চেনা, যার

পোশাকী নাম সুরক্ষাবিদ্যা (Cryptology) — আরও সহজ ভাষায় বললে পাসওয়ার্ড প্রটেকশন — এখানেও সেই সংখ্যা তত্ত্বের প্রয়োগ। কী কাণ্ড বলুন! বিজ্ঞানী নিজেই ভাবেননি কোনোদিন তাঁর আবিষ্কারের এই বিপুল ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটবে!

সব শুনে আপনারা নিশ্চয় বলবেন, "বাহবা বাবুলাল বাহবা বাহা"! কিন্তু দিনের শেষে আর একটিবার সত্যি কথাটা আপনাদের মনে করিয়ে দি? এসব ব্যবহারিক দিকের কথা মাথায় রেখে কিন্তু মৌলিক গবেষণা মোটেও হয় না। গবেষকরা আপনাতে আপনি মজে কাজ করেন জানার আনন্দে, শেখার আনন্দে, সৃষ্টির আনন্দে — এগিয়ে চলেন সত্যের পথে। তারই ফাঁকে মণিমুক্তোর মতো ঝরে পড়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। আজকে আপনারা বিজ্ঞানের যেসব সুবিধা ভোগ করছেন, তার বীজ লুকিয়ে রয়েছে ঐ শুদ্ধ আনন্দটুকুর মধ্যেই। তাই মৌলিক বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন যতটা বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণের জন্য, ঠিক ততটাই মানবসভ্যতা বিকাশের জন্যও। কে জানে হয়তো-বা এরকম করেই আরো অনেক নতুন দিক খুলে যাবে মৌলিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে! হয়তো কিছুদিন পরে, হয়তো-বা কালই। আপনার-আমার স্বপ্ন দিয়েই তো এগোয় সভ্যতা। স্বপ্ন দেখতে দোষ কোথায়?

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া ভালো, তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির তেজস্ক্রিয়তার সাথে NMR-এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এই মৌলগুলি সাধারণত MRI-এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

[২] MRI-এর পিছনে যে আবিষ্কারগুলি রয়েছে সেগুলো নিয়ে জানতে এখানে দেখুন: http://www.magnetic-resonance.org/ch/20-02.html

[৩] ক্যুরিদ্বয় ছাড়াও অঁরি বেকেরেল-ও রেডিওঅ্যাকটিভিটি আবিষ্কারের সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশদে জানতে এখানে দেখুন: http://www2.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/03/4.html

[৪] ক্যুরিদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে জানতে এখানে দেখুন: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/physics/curie/

[৫] রেডিয়েশন থেরাপি নিয়ে জানতে উইকিপিডিয়া-তে পড়ুন: https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_therapy

[৬] 3D মুভি-তে পোলারাইজেশন-এর ব্যবহার নিয়ে জানতে এখানে দেখুন: http://www.physics.org/article-questions.asp?id=56

[৭] 'মহাবিশ্বের আলো' নিয়ে প্রফেসর পাটকেলের কাছ থেকে শুনুন: https://bigyan.org.in/2015/06/22/first-light/

‘আকাশজুড়ে এই আধাঁরে’-এর কথা পড়ুন এখানে: https://bigyan.org.in/2016/03/01/dark/

[৮] জি পি এস-এর পিছনে ‘সাধারণ অপেক্ষবাদ’-এর ভূমিকা নিয়ে জানতে এখানে দেখুন:

https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jcuevas/Teaching/GPS_relativity.pdf

[৯] Gravitational waves বা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ-এর আবিষ্কার নিয়ে জানতে ‘বিজ্ঞান’-এ প্রকাশিত এই সিরিজ-টা দেখুন: https://bigyan.org.in/2016/05/23/gravitational-wave-detection-ligo_1/

ক্যালিফর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র ওয়েবসাইটে এই খবরটাও দেখুন:

https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

সুপ্রতীক পাল পেশায় জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তার নিজের কথায়, তিনি ভালবাসেন বেড়াতে, ছবি তুলতে, সাহিত্যচর্চা ও আবৃত্তি করতে, গান শুনতে, আর তার মাঝে একটু-আধটু গবেষণা করতে। শিক্ষা ও কর্মসূত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, খড়গপুর আই.আই.টি, পুণে-র IUCAA এবং জার্মানি-র বন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে আপাতত থিতু কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে। সাথে বেলুড় বিদ্যামন্দির-এর সাম্মানিক অধ্যাপক। তিনি যুক্ত কিছু আন্তর্জাতিক প্রজেক্টে, যার মধ্যে অন্যতম বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ ‘স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যারে’-র পরিকল্পনা। কিন্তু স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানে আগ্রহ বাড়ানোর সুযোগ পেলেই চলে যান।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
https://bigyan.org.in/2017/04/10/useful-science/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ এপ্রিল ১০, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

সৌরশক্তিকে বাষ্পবন্দী করার নতুন ফন্দি

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়
অনির্বান ঘোষ

জল থেকে বাষ্পীকরণের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে বোতলবন্দী করার এক নতুন পদ্ধতি বেরিয়েছে। ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জল গরম করার এক অভিনব উপায় বার করেছেন যাতে সৌরশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ অব্দি বাষ্পের মধ্যে পরিচালিত হয় [১]। তুলনার জন্য বলি, এর আগের রেকর্ডটা ছিল ২৪ শতাংশ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এ বাজারে নতুন কি হতে পারে? সৌর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে (সোলার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট-এ) প্রতিদিন সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এই দুটো ভিন্ন প্রকৃতির শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করছে জল। জল থেকে বাষ্প, বাষ্পের তোড়ে টারবাইন ঘুরছে, টারবাইনের গতিশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। এখানে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যাটা হলো, গতানুগতিক পদ্ধতিতে জলে তাপ সঞ্চার করতে থাকলে প্রথমে পুরো জলটা ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হয়। তারপর বাষ্পীভবন শুরু হয়। এদিকে, জলের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা খুব কম । সাধারণত সূর্যের আলো সরাসরি জলে এসে পড়ে না, পড়ে কোনো একটা তাপশোষক আচ্ছাদনের উপর (পরের ছবিটাতে বাঁদিকের সোলার কালেক্টরটি দেখুন)। সেখান থেকে জলে সেই শক্তি চালান হয়। জল যেহেতু তাপের কুপরিবাহী, তাই এই চালান হওয়ার হার বড়ই কম। গরম আচ্ছাদন থেকে জল, জল থেকে আরো জল,

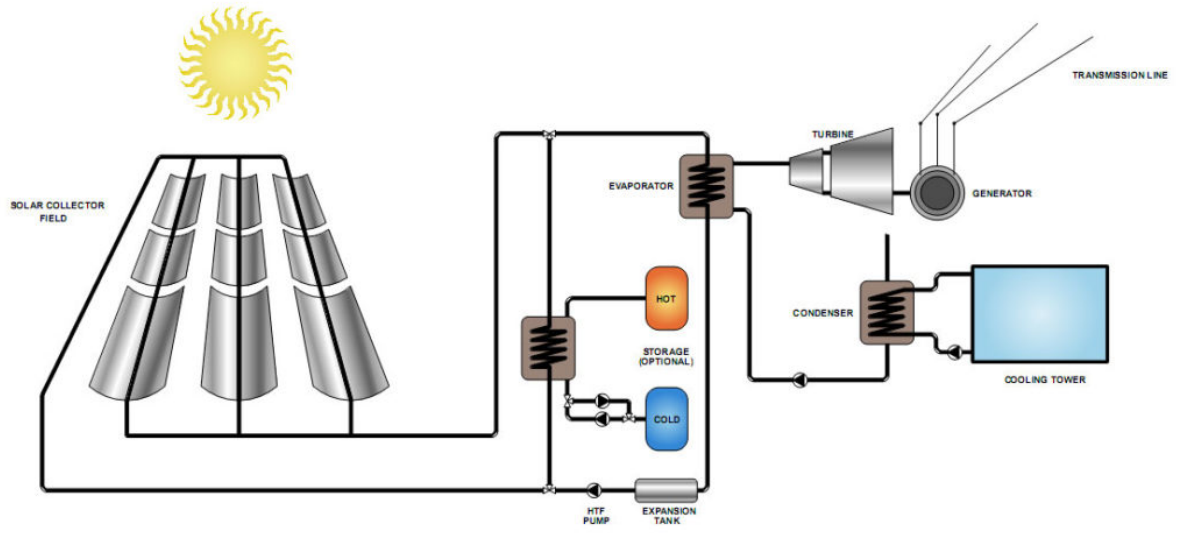

ট্রেডিশনাল সৌর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নকশা।
ছবির উৎস : http://www.solarthermalpower.com

এই যাত্রাপথে তাপমাত্রা ঝুপ করে পড়ে যেতে থাকে। পুরো জলের বাষ্পীভবনের তাপমাত্রায় পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক শক্তির অপচয় হয়। কারণ জল গরম হওয়ার ঢিলেমির মাঝে বেশিরভাগ শক্তি পুনঃবিকিরণের মাধ্যমে ওই গরম আচ্ছাদন থেকে পালিয়ে যায়।

এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার কিছু উপায় বেরিয়েছে। জলে সুপরিবাহী ন্যানোপার্টিকেল [২] ছড়িয়ে জলের পরিবহণ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে [৩]। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হয়নি। শক্তি পরিবর্তনের কার্যকারিতা বা এফিসিয়েন্সি, অর্থাৎ সৌরশক্তির কতটা অংশ বাষ্পের শক্তিতে পরিণত হলো, তার রেকর্ড এখনো অব্দি ছিল ২৪ শতাংশ। সাধারণত এই সমস্যা এড়াতে একটা মাঝারি রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে জল ফোটানোর জন্য সূর্যের আলোকে অনেক কায়দা করে ফোকাস করতে হয়। বাঘা বাঘা আয়না সূর্যের আলোকে প্রতিফলন করে তাদের ফোকাল লাইনে, যাতে প্রয়োজনীয় ঔজ্জ্বল্য পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে সেই আয়না যাতে সূর্যমুখী হয়ে সূর্যের পরিক্রমা অনুসরণ করে, তারও জাঁদরেল ব্যবস্থা থাকে। সব মিলিয়ে, খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার।

ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক অন্য পথে হাঁটলেন [৪]। কাঁড়ি কাঁড়ি জলের মধ্যে শক্তি পাচার করার চেষ্টা না করে যদি এমনটা করা যায় যে সৌরশক্তি বুঁদ হয়ে জমে থাকলো আর জল সুড়সুড় করে তথায় এসে বাষ্পীভূত হয়ে গেলো! ধুর, এমনটা হয় নাকি? তবে আর বলছি কি!

এই ভেলকিটা দেখাতে একটা দ্বিস্তর (ডাবল লেয়ার) কার্বন-এর চাঁই ব্যবহার করলেন গবেষকরা। উপরের স্তরে আছে এক্সফোলিয়েটেড গ্রাফাইট। গ্রাফাইট বলতেই মাথায় আসে থাকে থাকে সাজানো কার্বন অণুর স্তর। সেই গ্রাফাইট নিয়ে মাইক্রোওয়েভে বিকিরণের মাধ্যমে গরম করলে স্তরগুলোর মধ্যে থাকা গ্যাসের প্রসারণ হয়, ফলে গ্রাফাইটও ফুলে ফেঁপে চৌচির হয়ে যায়। একেই বলে এক্সফোলিয়েটেড গ্রাফাইট। আর

তামিলনাড়ু-তে সৌরশক্তিকে ধরার প্রকাণ্ড আয়োজন।
ছবির উৎস : https://timesofindia.indiatimes.com

নীচের স্তরে আছে কার্বনের শোলা। নীচের ছবিতে যে জিনিসটা জলে ভাসছে, সেটাই দ্বিস্তর-সমৃদ্ধ কার্বন-এর চাঁই।

দুটো স্তর মিলে জল টেনে বাষ্পে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ করে।

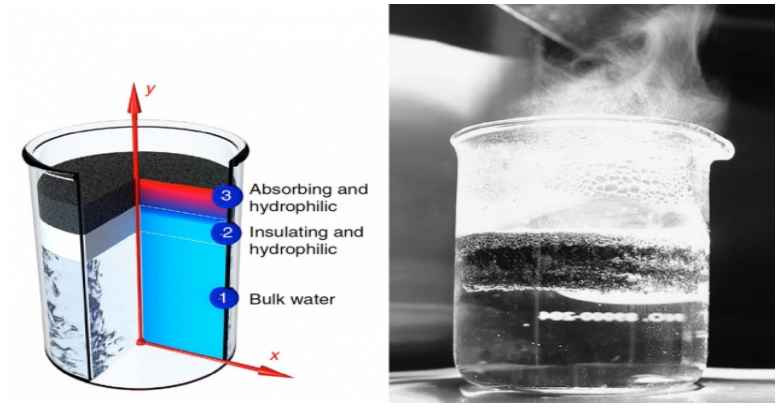

ডাবল লেয়ার স্ট্রাকচার নিজে থেকেই সৌরশক্তিকে বগলদাবা করে বাষ্পে চালান করে। ছবির উৎস : http://news.mit.edu/2014/new-spongelike-structure-converts-solar-energy-into-steam-0721

শর্তগুলো কি? প্রথম শর্ত, গ্রাফাইটের ছিবড়েগুলো সূর্যালোকের প্রায় সবটাই শুষে নেবে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্রায় ৯৭ শতাংশ শুষে নিচ্ছে। দ্বিতীয় শর্ত, সেই শক্তি শুষে নিয়ে যখের মতো আগলে বসে থাকবে। তৈরী হবে কিছু তাপকেন্দ্র (হটস্পট)। নীচের কার্বনের শোলা সেই কাজেই সাহায্য করে। তার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা যৎসামান্য, তাই শোষিত শক্তি সেই দিকে পালাতে পারে না। তৃতীয় শর্ত, কার্বনের শোলায় যথেষ্ট ছিদ্র থাকতে হবে যাতে জল উঠে আসে। তাও আছে।

কিন্তু ছিদ্র আছে বলেই তো আর ভাসমান শোলা দিয়ে সুড়সুড় করে জল উঠে আসবে না। তাই, শেষ শর্ত হলো, জলকে টানতে হবে। দুটো স্তর-ই হাইড্রোফিলিক বা জলপ্রেমী। ক্যাপিলারি অ্যাকশন-এর মাধ্যমে ছিদ্র দিয়ে জলটাকে উঠে আসতে সাহায্য করে। ক্যাপিলারি অ্যাকশন কি? সেটা দেখতে একটা খুব সরু স্ট্র একপাত্র জলে ঢোকান। স্ট্রয়ের ভিতরের জলটা পাত্রের জলের তুলনায় একটু উপরে

উঠে আসবে – স্ট্র যত সরু হবে তত বেশি দূর উঠে আসবে। আমাদের কার্বন শোলার ছিদ্রগুলো এতো সরু আর এতো বেশিসংখ্যক যে জল খুব চটপট উপরের গ্রাফাইট স্তরে পৌঁছে যায়।

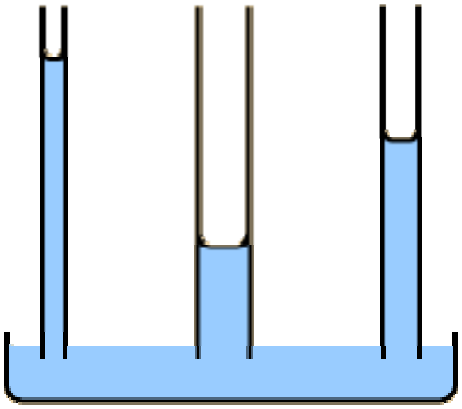

ক্যাপিলারি অ্যাকশন। ছবির উৎস : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

এই চারটে প্রকৃতির সম্মিলনের ফলে এমন একটা চাঁই তৈরী হলো যাকে স্রেফ জলে ভাসিয়ে সূর্যের আলোকে সফলভাবে বাষ্পবন্দী করে ফেলা গেল। কোনোরকম আলোপ্রতিফলনকারী কিংবা ফোকাসিং-এর প্রয়োজন পড়ল না। অবশ্যই, এটা যাকে বলে, প্রুফ-অফ-কনসেপ্ট। অর্থাৎ, বিজ্ঞানীদের ভাষায়, আমি দেখিয়ে দিলাম এটা সম্ভব, কীভাবে এর ইস্তামাল করবেন ব্যাপক হারে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেল-এ), সেটা আপনার মাথাব্যথা। তবে, বলতে লোভ হচ্ছে, কয়লা তথা অন্যান্য জ্বালানী-নির্ভর শক্তির শেষের দিন আরো ঘনিয়ে এলো।

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ নভেম্বর ৬, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে 'ম্যাথওয়ার্কস' নামক একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরত। এবং 'বিজ্ঞান' দল-এর একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য।

অনির্বান ঘোষ জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পি এইচ ডি করেছেন। পড়াশুনো করেছে খড়গপুর আই আই টি থেকে।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2017/07/10/dirac_equation_in_graphene/

প্রচ্ছদের ছবির উৎস : উইকিপিডিয়া

তথ্যসূত্র :

[১] Steam from the sun, MIT News

[২] ন্যানোপার্টিকেল আর কিছুই না, এক থেকে ১০০ ন্যানোমিটার সাইজের কণা। কণাগুলি একদম অণুর সাইজ না হলেও এতই ছোট যে তাদের বাইরের ক্ষেত্রফল (surface area) তাদের আয়তনের (volume) তুলনীয়। সাধারণত বস্তুর পদার্থবিদ্যা বুঝতে তাদের ভিতরটা নিয়ে ভাবলেই হয়, তাদের উপরিতলে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। ন্যানোপার্টিকেল-এর ক্ষেত্রে তাদের উপরিতলটাও জরুরি হওয়ার ফলে নতুন সব পদার্থবিদ্যা বেরিয়ে পড়ে যেটা ওই উপরিতলেই হয়। এটা দিয়ে একটা গোটা প্রযুক্তি শুরু হয়ে গেছে: ন্যানোটেকনোলজি।

[৩] Lenert, A. & Wang E.N., Optimization of nanofluid volumetric receivers for solar thermal energy conversion, Sol. Energy 86, 253-265 (2012)

[8] Solar steam generation by heat localization, Nature Communications

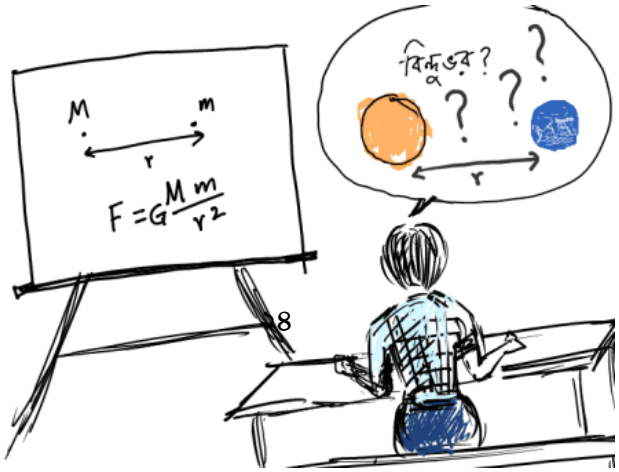

পাঠকের দরবার – মহাকর্ষ সূত্রে বিন্দু ভর

‘পাঠকের দরবার’ বিভাগের এই পর্বে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানের পোস্ট-ডকটরাল গবেষক ডঃ সুমন্ত্র সরকার উত্তর দিচ্ছেন আবু নঈম শিকদারের করা প্রশ্নের। মূল প্রশ্নটি হল- “মহাকর্ষ সূত্রে বিন্দু ভরের ধারণা কেন ব্যবহার করা হয়?”

প্রথমেই বলে দি যে বিন্দু ভর বা চার্জের ধারণা আসলে একটা গাণিতিক ধারণা, যা বাস্তব জগতে কখনো মোটামুটি ভাবে, ইংরেজীতে যাকে বলে approximately, খেটে যায়। যেহেতু এটা একটা approximation, তাই আমরা সব সময় এই ধারণা ব্যবহার করতে পারি না এবং এই ব্যাপারটা আমাদেরকে স্কুলে বলাও হয় না। তাই তোমার প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক।

বিশদে উত্তর দেওয়ার আগে একটা উদাহরণ দিই। ধরো, তোমার কাছে একটা সাদা রঙের ফুটবল আছে। ফুটবলটাকে একটা চেয়ারে রাখো। এবার ফুটবলটার একদম কাছে, এই ধরো এক হাত দূরত্বে গিয়ে বলটাকে দেখার চেষ্টা করো। দেখবে বলটা বেশ গোলগোল দেখতে লাগছে, আর তুমি বুঝতে পারছ ওটা একটা বল। তুমি দেখতে পাচ্ছ বলটা সাদা রঙের ষড়ভুজাকার আর পঞ্চভুজাকার অংশ দিয়ে বানানো, আর ওই অংশগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আবার সেলাই করা আছে, মানে তুমি বলের পুরো আকারটা দেখতে পাচ্ছ। এবার ধরো তুমি প্রায় ১০ মিটার দূরে চলে গেলে। দেখবে তুমি ওই ষড়ভুজাকার আর পঞ্চভুজাকার অংশগুলো দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু তুমি আর সেলাইগুলো ভাল করে দেখতে পাচ্ছ না। এবার আরও দূরে চলে যাও। ধরো তুমি একটা গোলপোস্টে বলটাকে রেখে অন্য গোলপোস্টে গিয়ে বলটাকে দেখছ। কি দেখবে? যে ওই ষড়ভুজাকার আর পঞ্চভুজাকার অংশগুলো আর তুমি দেখতে পাচ্ছ না, খালি বলটা যে সাদা সেটা বুঝতে পারছ। আর বলটাও কীরকম সাইজে ছোট মনে হচ্ছে। এবার সম্ভব হলে তুমি আরও দূরে চলে যাও। দেখবে বলটাকে আর বল বলে মনে হচ্ছে না, একটা সাদা বিন্দুর মত লাগছে। অর্থাৎ, তুমি যত দূরে চলে যাচ্ছ, বলটার আকারের বৈশিষ্ট্যগুলো তত মুছে যাচ্ছে আর শেষমেষ ওটাকে কেবল একটা বিন্দু বলে মনে হচ্ছে।

ঠিক একরকম ব্যাপার হয় মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে। যখন তুমি পৃথিবী বা অন্য কোনো গোলাকার বস্তুর খুব কাছে থাক, তখন পৃথিবীর এই গোলাকার ব্যাপারটা বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, পৃথিবী যে ঠিক গোলাকার নয়, বরং এবরো-খেবড়ো সেটাও স্যাটেলাইট দিয়ে মহাকর্ষ বল মেপে বোঝা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে বা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে রকেট পাঠাতে পৃথিবীর পুরো আকারটা জানা জরুরী। কিন্তু যখন তুমি পৃথিবী আর সূর্যের ভিতর মহাকর্ষ বল মাপতে যাবে, পৃথিবী আর সূর্য একে অপরের থেকে এতটাই দূরে যে দু'জনকেই ফুটবলটার মত বৈশিষ্ট্যহীন একটা গোল বস্তু হিসেবে ভাবতে পারো। এবার তুমি একটা ছোট্ট গণনা করে দেখাতে পারো যে, যদি একটা গোলকের সব জায়গায় সমান ঘনত্ব থাকে তাহলে গোলকটার বাইরে যেকোনো বিন্দুতে মহাকর্ষ বলের মান এমন হয়, যেন গোলকটার সমস্ত ভর ওর কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে। মানে তুমি যদি গোলকটাকে দেখতে না পাও, তাহলে গোলকটার বাইরে মহাকর্ষ বল মেপে বুঝতে পারবে না যে ওটা গোলক না একটা বিন্দু ভর। সেই কারণে, আমরা জ্যোতির্বিদ্যায় বেশিরভাগ সময়ই বিন্দু ভরের ধারণা ব্যবহার করতে পারি।

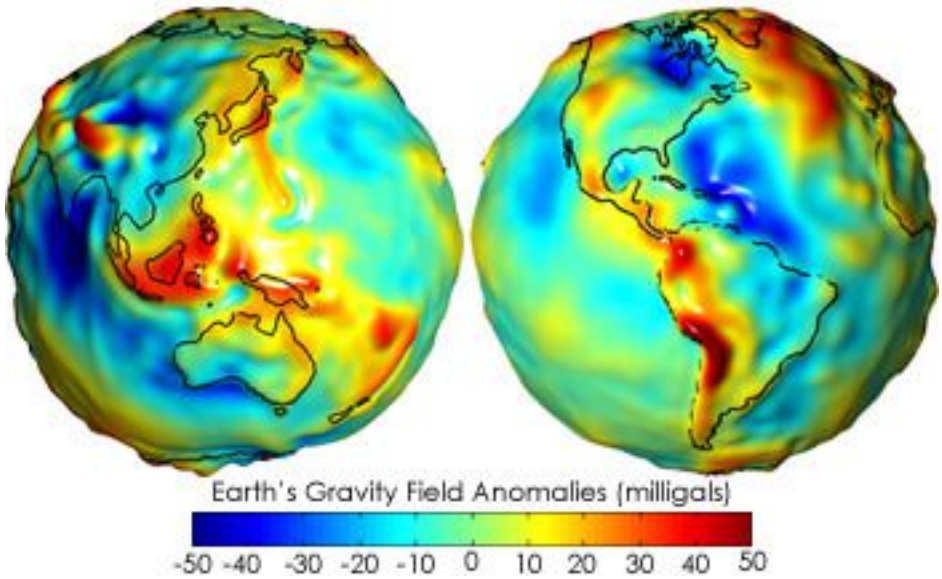

খুব কাছ থেকে দেখলে পৃথিবী যে ঠিক গোলাকার নয়, বরং এবরো-খেবড়ো, সেটা স্যাটেলাইট দিয়ে মহাকর্ষ বল মেপে বোঝা যায়। ছবির উৎস : উইকিপিডিয়া

কিন্তু কত দূরে যেতে হবে বিন্দু ভরের ধারণা ব্যবহার করার জন্য? জিনিসটা অঙ্ক কষে বের করা যায়। বিন্দুভরের ধারণার সাথে আরেকটি ধারণা যুক্ত করে আমরা বাস্তব জগতের এবড়ো-খেবড়ো বস্তুর জন্য মহাকর্ষ বা কুলম্বের বল হিসেব করতে পারি। এই যে নতুন ধারণাটির কথা বলছি তার নাম হল সুপারপোজিশান, যাকে বাংলায় উপরিপাত নাম দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ দুটি এলোমেলো আকারের বস্তু 'ক' আর 'খ'-এর মধ্যে বলের হিসেব করতে হ'লে তাদের অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করো, যেগুলোকে মোটামুটি বিন্দু হিসেবে ধরা যায়। তারপর, 'ক'-এর সব কটা বিন্দু আর 'খ'-এর সব কটা বিন্দুর মধ্যে কি বল কাজ করছে তা মহাকর্ষ বা কুলম্বের সূত্র লাগিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বের কর। এবার এই সব বলকে যোগ করো। বুঝতেই পারছ কাজটা খুব

একটা সহজ না-ই হতে পারে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যা লাগিয়ে অঙ্কটা কষে ফেলা যায়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কম্প্যুটারের সাহায্য নিতে হবে।

তবে তুলনামূলক সহজ উপায়ে এই অঙ্কটা অনেক সময় কষা হয় multipole expansion বলে একটা পদ্ধতি ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিতে তুমি যেকোনো আকৃতির একটা বস্তুকে বিন্দু ভর (monopole), একটা dipole, quadrupole, এইসব নানা আকারের সমষ্টি হিসেবে ভাবতে পারো। এইসব আকারগুলোর জন্য মহাকর্ষ বল মাপা সোজা। আর যেহেতু মহাকর্ষ বল সুপারপোজিশানের নীতি মেনে চলে, তাই আমরা এই বিভিন্ন আকারের মাধ্যমে মাপা মহাকর্ষ বলগুলোকে ভেক্টর পদ্ধতিতে জুড়ে দিয়ে বস্তুটার মোট মহাকর্ষ বল মাপতে পারি। গণনা করে দেখানো যায় যে monopole মানে বিন্দু ভরের জন্য বস্তুটি যে বল প্রয়োগ করে তার মান দূরত্বের সাথে সাথে সব থেকে ধীরে ধীরে কমে। এরপর আসে dipole এর পালা, তারপর আসে quadrupole-এর পালা, তারপর octopole … এরকম ভাবেই যত pole-এর পরিমাণ বাড়তে থাকে বলের মান দূরত্বের সাথে তত তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। এবার এই বিভিন্ন আকারগুলো থেকে বলগুলো কষে তুমি দেখাতে পারো যে কোনো প্রায় গোলাকার বস্তুর কেন্দ্র থেকে যদি তুমি মোটামুটি এক ব্যাস পরিমাণ দূরে চলে যাও, তাহলে শুধু বিন্দু ভর ব্যবহার করেই তুমি প্রায় সমস্ত গণনা করতে পারবে।

বিশদে জানতে :

Multipole expansion কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা জানতে উইকিপিডিয়ার এই লেখাটি https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_potential দেখতে পারো।

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- লেখাটিকে এক হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তবে লেখার বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এর থেকে বড় লেখা লিখতে হলে সম্পাদকদের সাথে লেখা জমা দেওয়ার আগে আলোচনা করে নিন (bigyan.org.in-at-gmail-dot-com)।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে।
  ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।